শান্তিনিকেতন

(সপ্তম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্চে, সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্চে—আমাদের চৈতন্য প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্চে—তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করচেন, এই হচ্চে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা

সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়—সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মত আকার ধারণ করে; এই জন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেই রকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্চে—চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্চে না—চারিদিকের দৃশ্যগুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্চে—সেই জন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্ম্ম সৃষ্টিদ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এই রকমই হয়—সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্য্যন্ত অধিকার করে,—শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছয় না—

এই জন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে—তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। সূর্য্য উঠ্‌চে ত উঠ্‌চে—নদী বইচে ত বইচে—গাছপালা বাড়চে ত বাড়চে—প্রতিদিনের কাজ নিয়মমত চল্‌চে ত চল্‌চে। সেই জন্যে এমন কোনো দৃশ্য দেখ্‌তে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখিনে—এমন কোনো ঘটনা জান্‌তে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন—তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখ্‌লে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্বব্যাপারের

মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়—জগৎ একটা যন্ত্রের মত আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না—প্রতিমুহূর্ত্তেই এই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্চে বিকীর্ণ হচ্চে ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওষধি, বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্ব্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না—তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এই জন্যই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

সত্যকে দেখা

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করচেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করচেন।

৩রা চৈত্র ১৩১৫

সৃষ্টি

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এই-খানে উপাসনা করতে বসি—এও একটি সৃষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা দু চার জনে পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্র হয়ে বস্‌লুম, তার পরে রোজ রোজ এই রকম চলে আস্‌চে।

ঘটনা এই বটে কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখ্‌লে এ একটি সামান্য ব্যাপার কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখ্‌লে এ বড় আশ্চর্য্য, প্রতিদিনই আশ্চর্য্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামণ্ডলী নিরন্তর সৃষ্টি করচেন। আমরা মনে করচি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্যে বসে কাজ

সেরে তার পরে অন্য কাজে চলে গেলুম, বাস্ চুকে গেল—কিন্তু এ ত ছোট ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়্চি, পড়াচ্চি, খাচ্চি, বেড়াচ্চি, তখনো এই আমাদের মণ্ডলীটির সৃষ্টিকর্ত্তা এরই সৃষ্টিকার্য্যে রয়েছেন। সেই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্ম্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন—তিনি আমাদের এই কয়জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুল্চেন—তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই—বিশ্বসৃষ্টি তাঁর যত বড় কাজ এও যেন তাঁর তত বড়ই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলি হচ্চে, হচ্চে, হয়ে উঠ্চে। দিনরাত, দিনরাত! আমরা যখন ঘুমচ্চি তখনো হচ্চে, আমরা যখন ভুলে আছি তখনো হচ্চে। সত্য যখন আছে, তখন কিছুই হচ্চে না, বা একমুহূর্ত্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভুবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাজ করচেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভুবনকে তার যথাস্থানে যথানিয়মে দেখ্‌তে পাচ্চি—আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করচেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসচি। বিশ্বভুবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করচে—যেখানে আমাদের দূরবীন পৌঁছয় না, মন পৌঁছয় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বল্‌চে নমোনমঃ—আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি—যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাঙ্গণে বসে আছেন;—কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য বিকীর্ণ করচেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ সৃষ্টি চল্‌চে তারও শক্তি বিকীর্ণ করচেন—আমাদের কয়েকজনের মনকে এই বিশেষ

ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্চেন—আমাদের কয় জনের প্রকৃতি, সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মুহূর্ত্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুল্‌চেন—এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাব তখনো তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝখানের সেই সত্যকে আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব—তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব—আমরা প্রত্যহ জেনে যাব—সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনন্ত সৃষ্টি—আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি সৃষ্টি—তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাণ্ডটিতে প্রকাশিত হচ্চে—সেই প্রকাশককে আমরা দেখে যাব।

৩রা চৈত্র ১৩১৫

মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নূতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মত অত্যন্ত আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল—আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে যে জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেন্ত ভাবে জড়িত নয় তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অনুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্য্যের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন এবং ভোগের আয়োজন —যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্ব্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা কতপ্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকেজমকে লোকের চক্ষুকর্ণকে ঈর্ষা ও লুব্ধতায় আকৃষ্ট করে আকাশে মাথা তুলেছিল তা একটি মুহূর্ত্তেই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্যে বারবার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারিনে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে

ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝাটাকে জঞ্জালের মত মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্য্য কিছুই নেই। কোনো-প্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তাহলে ধনজনমান ত মন থেকে খসে পড়ে একেবারে শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সে রকম ছেড়ে দেওয়া ফেলে দেওয়া নিতান্তই একটা রি তা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মত—যা ছিল না তাকেই চমকে উঠে' নেই বলে জানা।

বস্তুত সংসার ত মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কি। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে কিন্তু সংসারে ত ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। সূর্য্যালোকে ত কোনো কালিমা পড়ে নি—আকাশের নীল

নির্ম্মলতায় মৃত্যুর চাকা ত ক্ষতির একটি রেখাও কাট্‌তে পারে নি ; অফুরান সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্‌টা ? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি সূচ্যগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাখ্‌তে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ঐ আমার উপরেই সমস্ত জিনিষের প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই বালির উপরে ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধূলায় পড়ে ধূলিসাৎ হয়।

আমি বলে' যে কাঙালটা সব জিনিষকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিষকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে—কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাট্‌তে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন

সর্ব্বত্রই তাকে দেখ্‌তে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখ্‌বে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখ্‌তে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাকিয়ে খেটে মরে—মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষুধার্ত্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে সমস্তই রইল পড়ে কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই

যদি চিরন্তন বলে না জানি তাহলেই যথেষ্ট হল না—কারণ, সে রকম বৈরাগ্যে কেবল শূন্যতাই আনে। সেই সঙ্গে এও জান্‌তে হবে যে এই সংসারটা থাক্‌বে। অতএব আমার যা কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হবে ত্যাগের দ্বারা নয়;—আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না, সে দিতে চায় এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলি দিচ্চেন, তিনি নিজের জন্যে কিছুই নিচ্চেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে;—

নিজের ভোগের জন্ম লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টান্‌বে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সত্য যদি তা দান করি—যদি তা নিজে নিতে চাই ত সমস্তই মিথ্যা। সেই কথাটা যখন ভুলি তখন সমস্তই উল্টা-পাল্টা হয়ে যায়—তখনই শোক দুঃখ ভয়—তখনি কাম ক্রোধ লোভ; তখনি, স্রোতের মুখে যে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্ম আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিষ স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যখন মনে করি যে নিজে নিচ্চি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে—এবং সেই সঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরকে তাদের খোরাকি-স্বরূপ হৃদয়ের রক্ত জোগাতে থাকি।

৮ঠা চৈত্র

তরী বোঝাই

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখে-ছিলুম এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করচে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু দ্বীপের মত—চারি-দিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত—ঐ একটু-খানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে—সেই-জন্যে গীতা বলেছেন--

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আসচে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠ্‌চে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ঐ চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্ম্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে

দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না—কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখ তখন সংসার বলে—তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কি? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি ত রাখ্‌বার যোগ্য নও!

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্ম্মের দ্বারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করচে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করচে, রক্ষা করচে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্চে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্চে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্চে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে—ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিষ নয়।

৪ঠা চৈত্র

স্বভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কি? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কি? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্চে বিসর্জ্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জ্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই—কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্ম্মই হচ্চে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জ্জন করা। আমরাও তা জানি—আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জ্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুসি নয় সে দিয়ে খুসি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মত জেগে ওঠে তাহলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না—যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি, দেব, তখনি আমাদের আনন্দের দিন,—তখনি সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব?

ঐ যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে কাঙাল সব জিনিষই মুঠো করে ধরতে চায়—যে কৃপণ নেবার মৎলব ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মৎলব ছাড়া কিছু করে না—সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে

পরমাত্মীয়ের মত সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয়—কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে—না জন্মায় না মরে। কিন্তু ঐ অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে—কিছু না পারুক অন্তত তার ঐ নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, এ-কে একটা বাইরের লোকের মত আমি দেখ্‌ব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বল্‌ব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বল্‌বনা যে এ সমস্ত আমি পাচ্ছি আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি

বারবার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরেনা বলে আবর্জ্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরচি। এই মরণ-ধর্ম্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্চি।

অহং-এর স্বভাব হচ্চে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্চে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর একটা বেগ কেবলি ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে—ভারি একটা সঙ্কট ঘনিয়ে ওঠে—আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে—সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারিদিকে ঘানির বলদের মত

পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না—সুতরাং এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এ-তে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না—তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্ম্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

৫ই চৈত্র

অহং

তবে অহং আছে কেন? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিষকে আমার বলতে চায় কেন?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্চে।

আমাদের ত সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ ত কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারিনে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে আমার বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়—এই বাধা কাটাতে

তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়; সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়—সে উপকরণকে বিশেষভাবে সাজায়—তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে' গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিষ বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কি করে? যদি কিছুই তার 'আমার' না থাকে তবে সে দেবে কি?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে এক-বার 'আমার' করে নেবার জন্তে এই অহং-এর দরকার। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে

পারবে তাকেই তিনি আমার বল্‌তে দেবেন—কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই দরিদ্র হয়ে থাক্‌বে! সে দেবে কি? বিশ্বভুবনের কিছুকেই তার আমার বল্‌বার নেই!

ঈশ্বর ঐখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোট শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেল্‌তে খেলতে ইচ্ছাপূর্ব্বক হার মেনে পড়ে যান—নইলে কুস্তির খেলাই হয় না—নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না—নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে—তেমনি ঈশ্বর আমাদের মত অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন—এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বল্‌তে দেন যে আমাদেরই জিত—বল্‌তে দেন যে আমার শক্তিতেই হল—বল্‌তে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন, আমারই সসাগরা বসুন্ধরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকৃতে হয়। সেই জন্য তিনি কাঠবিড়ালীর পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমুদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধ্‌চ বটে—সাবাস্‌ তোমাকে!

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন—এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্যটি কি?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম্ম আছে সেই ধর্ম্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্ম্মটি হচ্চে সৃষ্টির ধর্ম্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম্ম। দেবার ধর্ম্মই হচ্চে আনন্দের ধর্ম্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্চে আনন্দময়স্বরূপ—সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্ত্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়,

সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিষ সংগ্রহ করি—নইলে বিসর্জ্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল—যখন আমার ঘড়ায় তুলে আনি তখন সে আমার জল—তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাওগে তাহলে জল দান করা হল না—যদিচ সে জল প্রচুর বটে, এবং নদীও হয় ত অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডুষ দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল ত দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই

হাসিতেই আমার ফুল-তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই "আমার" বল্‌বার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মে না।

তবেই দেখা যাচ্চে, অহং-এর ধর্ম্মই হচ্চে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গৌরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এই রকম সব জিনিষেই নিজের নাম নিজের শিলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাক্‌ত তাহলে আত্মার যথার্থ কাজটি চল্‌ত না—সে দরিদ্র এবং জড়বৎ হয়ে থাক্‌ত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্ম্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে—আত্মার দেবার ধর্ম্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়—তবে কেবলমাত্র নেওয়ার

লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্ব্বত্র ভয়ঙ্কর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

তখন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না—অহং বলে এ সমস্তই আমি নিলুম।

সে মনে করে আমি পেয়েছি। কিন্তু ডালির ফুল ত বনের ফুল নয়, যে, কখনো ফুরোবে না, নিত্যই নূতন নূতন করে ফুটবে! পেলুম বলে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তখন শুকিয়ে যাচ্চে। দুদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায়—পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তখন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিষটা নেওয়া জিনিষটা কখনই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব, নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার

জন্য। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারি উপলক্ষ্য—অহংটা কেবল অহঙ্কারকে বিসর্জ্জন করতে হবে বলেই। নিজের দিকে একবার টেনে আন্‌ব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে ত নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বল্‌ছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বল্‌তে হবে, না ও আমার নয়, ও আমি নেব না—ও সমস্তই বাইরে রাখ্‌তে হবে, বাইরে দিতে হবে—ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুল্‌বো না। অহং-এর এই সমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। কারণ এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়—আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি

সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত—কেননা তিনি নিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন—আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা দ্বারা বদ্ধ হবার জন্যে হয় নি—এই রচনাগুলি-দ্বারাই সে মুক্ত হবে—তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে—কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারাই তার যথার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দরূপ অমৃতরূপ বিসর্জ্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেই জন্য অহং তখনি আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

৬ই চৈত্র

নদী ও কূল

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্ম্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মত যে নিয়তই লেগে রয়েছে—শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনা সংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতি-গত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুল্‌চে এবং কেবলি এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্ত্তন ঘটাচ্চে—আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করচে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তাহলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাক্‌বেএমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বল্লেই সে মিথ্যা হয় না তেমনি এই

অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য—সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্ব্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করচে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্চে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠ্‌চে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জম্‌চে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলচে। এই চর কতবার ভাঙচে, কতবার গড়চে, কত স্থান ও আকার পরিবর্ত্তন করচে—এর কোথাও বা গাছপালা উঠ্‌চে, কোথাও বা মরুভূমি—কোথাও জলাশয়ে পাখী চরচে

কোথাও বা বালির উপর কুমীরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্চে।

এই চিরপরিবর্ত্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তাহলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়—ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য।—শেষকালে ফল্গুর মত নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মত। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র; আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে—সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে দেশ দিয়ে যে কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে—এই জিনিষটি কেবলি ভাংচে, গড়চে, কেবলি আকার পরিবর্ত্তন করচে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টি-কর্তাকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়—আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারিদিকেই বড় হয়ে উঠে আত্মাকে বল্‌তে থাকে—তুমি চল্‌তে পাবে না, তুমি তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধন দৌলতেই থাক, এই ঘরবাড়িতেই থাক, এই খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই থাক।

যদি আত্মা আট্‌কা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকাল পাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে এই কূলের

দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাক্‌লে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাক্‌ত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা, আত্মার রূপ—এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করচে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করচে;—এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সঙ্গীত।

কিন্তু যখনি উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে—তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতিরোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা

অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে—নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে—তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে!

৭ই চৈত্র

আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে—সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্ম্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্ম্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকৃত তাহলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকৃত তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকৃত তাহলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে

অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলি যদি বৈপরীত্যই থাকত তাহলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাক্‌ত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই —যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই—সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করচে।

মনে কর একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে—ছোট মাপকাটি কি করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্ত্বকে প্রকাশ করে? না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না এখনো শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাক্‌ত তা হলে বৃহত্ত্বের সঙ্গে কেবল মাত্র নিজের বৈপরীত্যটুকুই জান্‌ত কিন্তু সে নাকি চলেছে এই চলার দ্বারাই বৃহত্ত্বকে পদে

পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার দ্বারা মাপকাটি ক্ষুদ্র হয়েও বৃহত্ত্বকে প্রচার করচে। এইরূপে ক্ষুদ্রে বৃহতে বৈপরীত্যের মধ্যে যেখানে একটা সামঞ্জস্য ঘটচে সেইখানেই ক্ষুদ্রের দ্বারা বৃহতের প্রকাশ হচ্চে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়—তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভি-ব্যক্তি আছে একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চল্‌তে চল্‌তে সে ক্রমাগতই বল্‌চে আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করচে। রূপের সীমাটি না থাক্‌লে তার গতিও থাক্‌তে পারত না—তার গতি না থাক্‌লে অসীম ত অব্যক্ত হয়েই থাক্‌তেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে, না জন্মায় না মরে; অহং জন্ম-

মরণের মধ্য দিয়ে চলেছে—আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে' তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জ্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে—রূপ কেবলি বলে, "এ-কে আমি বাঁধতে পারলুম না—এ আমাকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চল্‌চে।" এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দ্বার নয়—সে যেন তার রাজপথের

বিজয় তোরণের মত—তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে সে চলে যাচ্চে—এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করচে মাত্র। অহং নিয়ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপ্‌চে আর কেবলি বল্‌চে—“না এ-কে আমি সীমা-বদ্ধ করে রাখতে পারলুম না।” সে যেমন সব জিনিষকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়—বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম্ম। অথচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি তেমনি বদ্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্ব্বনেশে জিনিষ আর কি হত!

তাই বল্‌ছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলি বাঁধচে এবং ছেড়ে দিচ্চে সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে আত্মার মুক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করচে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মুক্তির প্রকাশ কোথায় থাকৃত, যদি না ছেড়ে দিত তাহলেই বা কোথায় থাকৃত?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে এইটেই হচ্চে ওর সামঞ্জস্য। অহং সে কথা ভোলে—সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্যে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে দুঃখ দেয় ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে' ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়, ভাবা ম্লান হয়ে যায়।

যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে

না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেই জন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহা বিদ্বান বলিনে—তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করচে, বাধাগ্রস্ত করচে না।

এই জন্যেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি —আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি—আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায় —মোহমুক্ত নির্ম্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে—সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাৎড়ে না বেড়ায়; সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের

সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে; নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে,মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।

৮ই চৈত্র

আদেশ

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবেনা তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সে রকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিমভাবে মান্‌তে পারিনে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানাননি—কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ—সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও! সূর্য্যকেও তাই বলেছেন—পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন।

সূর্য্য তাই জ্যোতির্ম্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্চে, সেইখানেই কুঁড়ি মুষ্‌ড়ে যাচ্চে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্চে—সেইখানেই বন্ধন, বিকার, বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ,—সেইখানেই তার পাপ।

এই জন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ

স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বল্লেন তুমি লোভ কোরোনা, হিংসা কোরোনা, বিলাসে আসক্ত হোয়োনা। যে সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলির মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কি? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেননি তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্ব্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা

আত্মার ধর্ম্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম্ম। তাঁর সেই ধর্ম্ম পরিপূর্ণ—কেননা তিনি শুদ্ধম্ অপাপ বিদ্ধং—তিনি নির্ব্বিকার তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্ব্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কি হব? পরমাত্মার মত সেই স্বরূপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভু। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্ম্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবেনা।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির

মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে—যে প্রার্থনা দেশ-কালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠ্‌চে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে প্রার্থনা—যে প্রার্থনার যুগ-যুগান্তব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে—সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে প্রকাশ কর। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন আমাকে সত্যে প্রকাশ কর! আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ কর, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ কর। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হোক্, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক্—সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চির কালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন— এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

৯ই চৈত্র

সাধন

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করচি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্চিনে কেন? আমাদের মন বস্‌চে না কেন? আমাদের ভাব জম্‌চেনা কেন?

সে কি অম্‌নি হবে, আপনি হয়ে উঠ্‌বে? এতবড় লাভের খুব একটা বড় সাধনা নেই কি? ঈশ্বরকে পাওয়া বল্‌তে কতখানি বোঝায় তা ঠিক মত জান্‌লে এ সম্বন্ধে বৃথা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়।

ব্রহ্মকে পাওয়া বল্‌তে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তা হলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া ত অমন একটি ছোট ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে

একমনে নিযুক্ত করলুম কই? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব; অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জান্‌তে চাও এই যে উপদেশ সে উপদেশের মত তপস্যা হল কই?

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপস্যা? জীবনের অল্প একটু উদ্বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর? বল, যে, এই ত উপাসনা করচি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্চিনে কেন? এত সস্তায় কোন্ জিনিষটা পেয়েছ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাক্‌বার উপযুক্ত হবার জন্যে কি তপস্যাই না করতে হয়েছে? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন।

সেজন্ত ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠিনি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজ-সাধনা চলেইচে।

সমাজবিহারের জন্ত যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা তবে ব্রহ্ম বিহারের জন্ত বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই চারিটি কথা শুনে বা দুই চারটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে?

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে সে ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোট জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও

বড়—বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিষই বড়।

এইটি মনে রাখ্‌তে হবে প্রতিদিন সকল কর্ম্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুল্‌তে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা ত একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জাসঙ্কোচ করতে শিখেছে;—তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে;—সভাস্থলে স্থির হয়ে বস্‌তে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখ্‌লে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না।

সমাজের সঙ্গে মিলে থাক্‌বার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভাললাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণা ভয় এমন করে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে—যে সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছ, এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুল্‌তে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করচি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি সে প্রশ্ন এখন থাক্‌।

প্রথমে শরীরটাকে ত বিশুদ্ধ করে তুল্‌তে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পাকে এমন করতে হবে যে পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে

একেবারে সংস্কারের মত হয়ে আস্‌বে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্ব্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে—যে ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্ব্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি স্তব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুল্‌তে হবে—এ তনু ভগবানের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবেনা, অতি সহজেই সর্ব্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে—অর্থাৎ ভগবানের যে ইচ্ছা সর্ব্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ দ্বেষ লোভক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দিতে হবে—সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে

অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছচ্ছি না কেন সে যেমন অসঙ্গত বলা,—তেমনি নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্চিনে কেন এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

১০ ই চৈত্র

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্ত্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিষ ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না—সেই জন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিৎ খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তি-পথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়—শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে—শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে—যা

তোমাকে দেওয়া হয়নি তা নেবেনা এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বল্‌বেনা এই একটি শীল, ন চ মজ্জপো সিয়া — মদ খাবে না এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—"ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্‌সরতি।" শীল সকলকে কি বলে অনুস্মরণ করেন ?

"অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি ভুজিস্‌সানি, বিঞ্‌ঞুপ্‌পসত্থানি, অপরামট্‌ঠানি, সমাধি সংবত্তনিকানি।" অর্থাৎ আমার এই শীল খণ্ডিত হয়নি, এ'তে ছিদ্র হয়নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয়নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখ্‌চি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করেনি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই

শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয়নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্ত্তণ করবে।" এই বলে আর্য্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারম্বার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্চে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা "মঙ্গল সুত্তে" কথিত আছে—সেটি অনুবাদ করে দিই :—

বহূ দেবা মনুস্‌সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকাঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্চে যে, বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন সেই মঙ্গলটি কি বল!

বুদ্ধ উত্তর দিচ্চেন :—

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানাঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীয়ানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা

করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্চে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো চ, পুব্বে চ কতপুঞ্‌ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্ম্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্ব্বকৃত পুণ্যকে বর্দ্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্ম্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্‌পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া, এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো,
অনাকুলা চ কম্মাণি এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম্মকরা এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মাণি, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

দান, ধর্ম্মচর্য্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আবতী বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গল মুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্ম্মকর্ম্মে অপ্রমাদ এই উত্তমমঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুঠ্‌ঠী চ কতঞ্ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গল মুত্তমং

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্ম্মকথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্সতা সমণানঞ্চ দস্সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্ম্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপোচ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়া সচ্চান দস্সনং
নিব্বান সচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুঠ্ঠস্স লোক ধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গল মুত্তমং ॥

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোক-ধর্ম্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্ব্বত্র অপরাজিত, তারা সর্ব্বত্র স্বস্তি লাভ করে তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্ম্মনীতিই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্ব্বাণই চরম? তা হতে পারে কিন্তু সেই নির্ব্বাণটি কি? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছন যেত না। তবে কেবলি সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বল্‌তে বল্‌তে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সর্ব্বশূন্যতার মধ্যে নির্ব্বাপন লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল ত মঙ্গল দেখ্‌চিনে —মঙ্গলের চেয়েও বড় জিনিষটি দেখচি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে—অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভাল উদ্দেশ্য সাধন করে—কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্চে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলি দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ

নেই সেইটেই হচ্চে শেষের কথা—সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি, নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ ত বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়—এ ত বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়—এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তি ভাবনা—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু; সব্বেসত্তা মা যথালদ্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক্, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ

করুক! সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক্!

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাক্‌লে এই মৈত্রী ভাবনা সত্য হয় না—এইজন্য শীল গ্রহণ শীল সাধন প্রয়োজন—কিন্তু শীল সাধনার পরিণাম হচ্চে সর্ব্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার—এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এত শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বল্‌চেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মথ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ,
সুবচো চস্‌স মৃদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থ কুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই:—তিনি শক্তিমান, সরল,

অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্সকো চ সুভরো চ,
অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্ট হৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক অপ্রগলভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক নিরাপদ হোক্ সুস্থ হোক্।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথূলা,
দিঠ্‌ঠা বা যে চ অদিঠ্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কি সবল কি দুর্ব্বল, কি দীর্ঘ কি প্রকাণ্ড, কি মধ্যম, কি হ্রস্ব, কি সূক্ষ্ম কি স্থূল, কি দৃষ্ট কি অদৃষ্ট যারা দূরে বাস করচে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে অনবশেষে সকলেই সুখী আত্মা হোক্!

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতি মঞ্ঞেথ কথাচি নং কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্‌ঞা
নাঞ্‌ঞ মঞ্‌ঞস্স দুক্খ মিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না—কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়েবাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরোনা।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা এক পুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন নিজের একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্দ্ধে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিঠ্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিঠ্‌ঠেয্য
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলচ বসে আছ বা শুয়ে আছ। যে পর্য্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্য্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রী-ভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালবাসেন সেইরকম ভালবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্ব্বত্রই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্ব্বত্র—তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে ত ব্রহ্মবিহার হলনা।

কথাটা খুব বড়। কিন্তু বড় কথাই যে হচ্চে। বড় কথাকে ছোট কথা করে ত লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়কে চাওয়া। উপনিষৎ বলেচেন ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়কেই জান্‌তে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কি সে ত স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোট করে ঝাপ্‌সা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেননি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই ত হল লক্ষ্য। কিন্তু এ ত আমরা একেবারে পারব না। এইদিকে আমাদের প্রত্যহ চল্‌তে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে

তুলনা করে প্রত্যহ বুঝ্‌তে পারব আমরা কতদুর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্চে কিনা সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্চে কিনা, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্চে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়চে কিনা তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দ্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব্ব করেননি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চল্‌তে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীল সাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রী ভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন।

প্রতিদিন এই কথা স্মরণ কর যে আমার শীল অখণ্ড আছে অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট কর যে ক্রমশঃ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্ব্বভূতে প্রসারিত হচ্চে—অর্থাৎ একদিকে বাধা কাট্‌চে আর একদিকে স্বরূপ লাভ হচ্চে। এই পদ্ধতিকে ত কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না—এই ত নিখিললাভের পদ্ধতি, এই ত আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ ই চৈত্র

পূর্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন—তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যে রকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ কথাটিও ছোট কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে—এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন সেও বড় কম নয়। যেমন বলেছেন তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মত

ভালবাস। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেননি। বলেননি যে প্রতিবেশীকে ভালবাস; বলেছেন—প্রতিবেশীকে আপনারই মত ভালবাস। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালবাসায় গিয়ে পৌঁছতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন—শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যাননি—শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্য্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্য্যন্ত দান কর।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড় লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্য্যন্ত দিয়ে ফেল্‌তে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক

প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোট বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়কেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা ত সংসারীলোকের দুর্ব্বল বাসনাব মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোট করে দেখাতে চাননি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড় কথাকেই অসঙ্কোচে একেবারে শেষ পর্য্যন্ত বলেছেন।

এই বড় কথাকে এত বড় করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এতদূর পর্য্যন্তই যায়—তার প্রেম এত বড়ই প্রেম—তার ত্যাগ এত বড়ই ত্যাগ।

অতএব এই বড় লক্ষ্য এবং বড় পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস দেবে। নিজের অন্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি

আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করে তুল্‌বে।

লক্ষ্যকে অসত্যের দ্বারা ছেঁটে ক্ষুদ্র করলে, উপায়কে দুর্ব্বলতার দ্বারা বেড়া দিয়ে সঙ্কীর্ণ করলে তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়—যা আমাদের পাবার তা পাইনে, যা পারবার তা পারিনে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন। বুদ্ধ আমাদের কারো প্রতি অশ্রদ্ধা অনুভব করেননি, যখন তিনি বলেছেন "মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।" যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেননি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও!

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি

শ্রদ্ধালাভ করি। তখন আমরা ভূমাকে পাবার এই দুরূহ পথকে অসাধ্য পথ বলিনে—তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাভৈঃ বাণী অনুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যুক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ কর।

একবার ভিতরের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ—প্রতি দিন কোন্‌খানে ঠেক্‌চে। একজন মানুষের সঙ্গেও যখন মিল্‌তে যাচ্চি তখন কত জায়গায় বেধে যাচ্চে! তার সঙ্গে মিলন সম্পূর্ণ হচ্চে না। অহঙ্কারে ঠেক্‌চে, স্বার্থে ঠেক্‌চে, ক্রোধে ঠেক্‌চে, লোভে ঠেক্‌চে—অবিবেচনার দ্বারা আঘাত করচি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্চি। কোনমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আন্‌তে পারচিনে যার দ্বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সহজ এবং মধুর হয়। এই বাধা

যখন স্পষ্ট রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্চি তখন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাতে আমাকে একটি মানুষের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিল্‌তে দেবেনা তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন কর্ব্বে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন—যাতে শত্রুকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেননি—হাতে রেখে কথা কন্‌নি। তাঁরা বল্‌ছেন একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাঁতে বেঁচে উঠ্‌তে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহঙ্কারের দিকে স্বার্থের দিকে আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে প্রেমের দিকে পরমাত্মার দিকে

অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। যাঁরা এই মহাপথে যাত্রা করবার জন্য মানবকে নির্ভর দিয়েছেন একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

১২ ই চৈত্র

নীড়ের শিক্ষা

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই এ কথা বল্লে মানুষের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন তা হলে খোরাক কি? মানুষ বাঁচ্‌বে কি নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কি করে? মায়ের মুখ থেকে শুন্‌তে শুন্‌তে খেল্‌তে খেল্‌তে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে—ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তখন তার কথাগুলি আধ-আধ—ব্যাকরণ ভুলে পরিপূর্ণ—তখন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সঙ্কীর্ণ—কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষার এই অশুদ্ধতা এবং সঙ্কীর্ণতা

দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাক হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাক্‌বে না; ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বল্‌তেও পাববে না; তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয় তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠ্‌বে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করচে—ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে নিতে হবে—সেটাকে সর্ব্বত্র পাকা করে নিতে হবে—কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে নয়, তাকে গভীরতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চ্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। একদিকে পাওয়া আর একদিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে

প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে—আর শেখাটা নিয়মে, কর্ম্মে,—সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা দুটোই যদি পাশাপাশি না চলে তাহলে, হয় পাওয়াটা কাঁচা হয় নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

বুদ্ধদেব কঠোর শিক্ষকের মত দুর্ব্বল মানুষকে বলেছিলেন এরা ভারি ভুল করে, কাকে কি বোঝে, কাকে কি বলে তার কিছুই ঠিক নেই, তার একমাত্র কারণ এরা শেখবার পূর্ব্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক তাহলে যথাসময়ে পাবার জিনিষটা এরা আপনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপন মাত্র এদের কাছে করা হবে না।

কিন্তু ঐ চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা ত নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে! ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয় ও যে গতিও দেবে!

অতএব আমরা যতই ভুল করি যাই করি,

কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মান্‌তে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখ্‌ব এ চলবে না, যার কাছেও শিক্ষা পাব।

যার কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে—সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায়?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই—একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মুখ থেকে সে খাবার খায়। যদি তাকে বলি যে পর্য্যন্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্য্যন্ত খেতেই পাবেনা তা হলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চ্চা করব তেমন প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রসাদের জন্যে ক্ষুধিত চঞ্চুপুট মেল্‌তে হবে; তাঁর কাছ থেকে সহজ কৃপার

দৈনিক খাদ্যটুকু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে—এ ছাড়া উপায় দেখিনে।

এখন ত অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি—এখন ত নীড়েই পড়ে আছি। ছোটখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্য বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রয়—এই আশ্রয়ের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাদ্যের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমাদের কি দশা হবে?

তুমি বল্‌তে পার ঐ খাদ্যের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তাহলে চিরদিন নিশ্চেষ্ট হয়েই থাক্‌বে—নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলিনে—ওড়বার প্রয়াসে দুর্ব্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুল্‌তে হবে। কিন্তু কৃপার খাদ্যটুকু প্রেমের পুষ্টিটুকু প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তাহলে যখনি পুরোপুরি বল পাব তখন নীড়ে ধরে রাথে এমন সাধ্য কার? দ্বিজ শাবকের স্বাভাবিক ধর্ম্মই যে অনন্ত আকাশে ওড়া। তখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসার নীড়ে বাস করবে বটে কিন্তু অনন্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ডানাটা নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেই টুকুকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেখ্‌লেও সে কেবল ডালে ডালে লাফাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীন সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটা অত্যুক্তি প্রয়োগ করচেন—যা বল্‌চেন তার ঠিক মানে কখনই এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া। ঐ যে লাফাতে গেলে মাটির সংস্রব ছেড়ে যেটুকু

নিরাধার উর্দ্ধে উঠ্‌তে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তাঁরা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করচেন—ওটা কবিত্ব মাত্র, ওর মানে কখনই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসার নীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারিনে।

কিন্তু এসব আশ্চর্য্যকথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন যাঁরা পেয়েছেন। সেই আশ্বাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক—সে আকাশে ওড়বার জন্যেই প্রস্তুত হচ্চে সেই বার্ত্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রক্ষা করি—তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর

প্রসাদসুধা চাইব সেই সঙ্গে এই কথাও বল্‌ব আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো— আমি কেবল আনন্দ চাইনে শিক্ষা চাই—ভাব চাইনে কর্ম্ম চাই।

১৩ই চৈত্র

ভূমা

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব— তখন তিনি বল্লেন তোমার ও সব কথায় কাজ কি ? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড় দুঃখে পড়েছ—তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখ্‌তে পার না, যা রাখো তাতে তোমার আশা মেটে না এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই—সেইটে মেটাবার উপায় করে তবে অন্য কথা।—এই বলে দুঃখনিবৃত্তি-কেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই ত মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না।

সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখ্‌ছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্প পর্ব্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক—কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কি? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষেব একটা স্পর্দ্ধা আছে। আমি দুঃখ সইতে পারি—আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে এ কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্চে বড় হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম

নদীগিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে? ঠিক রাজ্যলোভ নয়—বড় হবার ইচ্ছা। বড় হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড় করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্চে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই—লাভক্ষতির নিরন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কিজন্যে এই অসহ্য কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে? ধনের পথে যতদূর সম্ভব বড় হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ কথা বলা মিথ্যা যে তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্চি। তাকে এ কথাও বলা মিথ্যা যে ভোগের বাসনা ত্যাগ

কর—আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে!

বুদ্ধদেব যে দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড় আকর্ষণ কি? সে এই, যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড় করে জানে। খুব বড় রকম করে ত্যাগ, খুব বড় রকম করে ব্রত পালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড় করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যই এমন কোনো একটা জায়গায় মানুষ ঠেক্‌তে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরতে হত।

অতএব মানুষকে যখন বলি দুঃখনিবৃত্তির

উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে রাগ করে বল্‌তে পারে চাইনে আমি দুঃখনিবৃত্তি। ওর চেয়ে বড় কিছু একটাকে দিতে হবে কারণ মানুষ বড়-কেই চায়।

সেই জন্যে উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয় বড়ই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এই বড়কেই জান্‌তে হবে এঁকেই পেতে হবে। এই কথা-টির তাৎপর্য্য যদি ঠিকমত বুঝি তাহলে কখনই বলিনে, যে, চাইনে তোমার বড়কে।

কেন না, টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো না কোন বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়কেই চাচ্চি। অথচ যাকে বড় বলে চাচ্চি সে এমন বড় নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বল্‌তে পারে আমার সব পাওয়া হল।

অতএব যিনি ব্রহ্ম যিনি ভূমা যিনি সকলের

বড় তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিঃবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন কর্‌লেই কি আর না করলেই কি—এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না কর্‌লেও চলে। আগে বাসনা দূর কর, শুচি হও, সবল হও—আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু না কিছু পাই তাহলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে—শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়—অনুষ্ঠানটাই দেবতা হয়ে ওঠে—পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে—ব্যাকরণ

যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

দুধে তেঁতুল দিয়ে সেই দুধকে দধি করবার চেষ্টা করলে হয় ত বহু চেষ্টাতেও সে দুধ না জমে উঠতে পারে—কিন্তু যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুধ সহজেই দই হয়ে উঠ্‌তে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম সুসিদ্ধ হয়ে উঠ্‌তে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই—গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ করে দিতে হবে তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন—তাহলে চলাও আনন্দ পৌঁছনও আনন্দ হয়ে উঠবে;—তাহলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসৎ থেকে সৎ হয় না, একেবারে না পাওয়া থেকে পাওয়া হয়

না এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে যাবেন।

১৫ই চৈত্র

শান্তিনিকেতন

(অষ্টম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা

প্রকাশক—

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

ওঁ

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্য্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বল্লেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখ্‌লেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা

নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখেনা ; সে দেখে কিন্তু শোনেনা।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্ব্বত্রই সন্ধান করে দেখ্‌লেন সর্ব্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্ব্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌছলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখ্‌চে কানও শুন্‌চে নাসিকাও ঘ্রাণ করচে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অন্যটা "না" হয়ে আছে তা নয় এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে—অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই

আমরা পেলুম ওঁ। বাস্, অঞ্জলি ভরে উঠ্‌ল।

ছান্দোগ্য বল্‌চেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে সুর, একদিকে সত্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সঙ্গীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়েনি—যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্ব্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারেনা; তাকে ঠেক্‌তে হয়, তাকে ঠকতে হয়, মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ—শেষকালে দেখে, এর সব তা'তেই পাপ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, "না" তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের একদিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্ম্মূল করে দিতে চেষ্টা করেননি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন

"এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ"

অর্থাৎ, আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করচেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই ;—তেমনি আবার বলেছেন,—

"তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।"

অর্থাৎ সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন।

"আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়—সেই দেখাই আবার সর্ব্বত্রেই।

ওঁ

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবস্বঃ অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা—মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করচেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করচেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই—এই জন্যই তিনি ওঁ।

এই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই সংসারকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে আবার যারা বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা আর একদিকে অবিদ্যা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর একদিকে সংসার এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেই-খানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জ্জিত, নিকটের দ্বারা

দূর বর্জ্জিত, চলার দ্বারা থামা বর্জ্জিত থামার দ্বারা চলা বর্জ্জিত, অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জ্জিত বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জ্জিত—কিন্তু

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও—অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি—কাউকে ছেড়ে তিনি নন—এইজন্য তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। একদিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করচেন আর-একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠ্‌তে পারচে না—তাই উপনিষদ বলেন—

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকা
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

ওঁ

সেখানে সূর্য্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎ সকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বল্‌তে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংস্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাট্‌তে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মান্‌তে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মান্‌তে চায় না—কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ—তিনি শিব তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয় তিনি এক।

তার মানে এ নয় যে, তবে এ সমস্ত কিছুই নেই—তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলচি, আমি তুমি নয়, তুমি বল্‌চ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্।

মিথুন্‌ যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্চেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জ্জিত হয়নি সেই-খানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে—অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়—যা চন্দ্রে নয় সূর্য্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য্য মানুষে—যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে—সেই এককেই, সেই হাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্চে ওঙ্কার।

১৫ই চৈত্র।

স্বভাবলাভ

মানুষের এক দিন ছিল, যখন, সে যেখানে কিছু অদ্ভুত দেখ্‌ত সেইখানেই ঈশ্বরের কল্পনা করত। যদি দেখ্‌লে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠ্‌চে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তখন সে কোনো একটা অসামান্য লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বল্‌ত, অমুক মানুষে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মূর্ত্তিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্ব্বত্র এক বলে' দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জান্‌তে পারল, যে যাকে অসা-মান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধি-

কার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনি মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। তার ধর্ম্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিন্তু সমস্ত স্বভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোনো একটা কৃত্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনো মানুষের মধ্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমন কি কেউ কেউ স্পর্দ্ধা করে বলেন সেই রকম করে দেখাই হচ্চে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িয়ে একটি কোনো বিশেষরূপে—সব মানুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মানুষে ঈশ্বরকে পূজা করাই তাঁরা বলেন পূজার চরম।

জানি, মানুষ এরকম কৃত্রিম উপায়ে কোনো একটা হৃদয়বৃত্তিকে অতি পরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে—কোনো একটা রসকে অত্যন্ত তীব্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য?

অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ হলে স্পর্শ-শক্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেই রকম একদিকের চুরির দ্বারা অন্যদিককে উপ্‌চিয়ে তোলাকেই কি বলে শক্তির সার্থকতা? যেদিকটা নষ্ট হল সেদিকটার হিসাব কি দেখ্‌তে হবে না? সেদিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিষ্কৃতি পাব?

কোনোপ্রকার বাহ্য ও সঙ্কীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেস্‌মেরিজিম্‌কে ধর্ম্ম সাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুল্‌লে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে স্বভাব থেকে সুতরাং মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব—আমরা যেদিকটাতে এইরকম অসঙ্গত

ঝোঁক দেব সেইদিকটাকেই বিপর্য্যস্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখ্‌তে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে—এই ত তার পাপের মূল এবং ধর্ম্মনীতি ত এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কি? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয় প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপ প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জ্জনস্পৃহা যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জ্জনের দিকেই মানুষের শক্তিকে একান্ত বাঁধতে চায় তখনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়—তখনই সে মানুষের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে।

এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কখনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায় না সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মানুষের প্রতি অনুরাগ যখন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তখনই তা কাম হয়ে উঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বর-লাভের বাধা।

এই জন্য সামঞ্জস্য থেকে বিকৃতি থেকে মানুষের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্চে ধর্ম্মনীতির একান্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলবার সময় যখন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তখন তার তাৎপর্য্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্ব্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে' কোন একটাকেই স্ফীত

করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য থাকে না তা নয়—চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্ম্মনীতিতে আমরা এই যে স্বভাবলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি—সমাজ এবং নীতিশাস্ত্র এজন্যে দিনরাত তাড়না করচে। এইখানেই কি এর শেষ? ঈশ্বর সাধনাতেও কি এই নিয়মের স্থান নেই? সেখানেও কি আমরা কোনো একটি ভাবকে কোনো একটি রসকে সঙ্কীর্ণ অবলম্বনের দ্বারা অতিমাত্র আন্দোলিত করে তোলাকেই মানুষের একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব?

দুর্ব্বলের মনে একটা উত্তেজনা জাগিয়ে তার হৃদয়কে প্রলুব্ধ করবার জন্যে এই সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কথা অনেকে বলেন।

যে লোক মদ খেয়ে আনন্দ পায় তার

সম্বন্ধে কি আমরা ঐরূপ তর্ক করতে পারি? আমরা কি বল্‌তে পারি মদেই যখন ও বিশেষ আনন্দ পায় তখন ঐটেই ওর পক্ষে শ্রেয়?

আমরা বরং এই কথাই বলি যে যাতে স্বাভাবিক সুখেই মাতালের অনুরাগ জন্মে সেই চেষ্টাই উচিত। যাতে বই পড়তে ভাল লাগে, যাতে লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশে ওর সুখ হয়, যাতে প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মে ওর মন সহজে নিবিষ্ট হয় সেই পথই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাতে একমাত্র মদের সঙ্কীর্ণ উত্তেজনায় ওর চিত্ত আসক্ত না থেকে জীবনের বৃহৎ স্বভাবক্ষেত্রে সহজভাবে ব্যাপ্ত হয় সেইটে করাই মঙ্গল।

ভগবানের ধারণাকে একটা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বেঁধে ভক্তির উত্তেজনাকে উগ্র নেশার মত করে তোলাই যে মনুষ্যত্বের সার্থকতা এ কথা বলা চলে না। ভগবানকেও তাঁর স্বভাবে পাবার সাধনা করতে হবে তাহলেই

সেটা সত্য সাধনা হবে—তাঁকে আমাদের নিজের কোনো বিকৃতির উপযোগী করে নিয়ে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাকেই আমরা মঙ্গল বল্‌তে পারব না। তার মধ্যে একটা কোথাও সত্য চুরি আছে। তার মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জস্য আছে যে, সে ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব সেখানে মোহকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না ;—যিনি শক্ত লোক তিনি মদ সহ্য করতে পারেন তাঁর পক্ষে একরকম চলে যায় কিন্তু তাঁর দলে এসে যারা জমে তাদের আর কিছুই ঠিক ঠিকানা থাকে না ; তাদের আলাপ ক্রমেই প্রলাপ হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা উন্মাদনার পথে অপঘাত মৃত্যুলাভ করে।

১৬ই চৈত্র।

অখণ্ড পাওয়া

ব্রহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে?

সংসারে আমরা অশন বসন জিনিস পত্র প্রতিদিন কত কি পেয়ে এসেছি। পেতে হবে বল্‌লে মনে হয় তবে তেম্‌নি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে মনে করি তবে ত পাচ্ছিনে। তখন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যাতে আমাদের অন্যান্য পাওয়ার সামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের যে ফর্দ্দটা আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে গাড়ি আছে আমার ঘটি আছে বাটি আছে তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখার দরকার

এই যে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কি? সে কি অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে আরো একটা বড় জিনিষকে যোগ করবার আকাঙ্ক্ষা?

তা কখনই নয়। কেন না যোগ করে করে জড়ো করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রী গুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিরন্তর কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্যেই কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে? তাঁকেও কি আবার একটা তৃতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে জোড়া দিয়ে বস্‌ব? আরো জঞ্জাল বাড়াব?

কিন্তু আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চায় তার মানেই হচ্ছে, সে বহুর দ্বারা পীড়িত এই জন্য সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এই জন্য সে ধ্রুবকে চায়—নূতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চায় না—যিনি নিত্যোঽনিত্যানাং

সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন, সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়—যিনি রসানাং রসতমঃ সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম তাঁকেই চায় আর একটা কোনো নূতন রসকে চায় না।

সেই জন্যে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখ্‌বে—আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিষ সন্ধান বা নির্ম্মাণ করবেনা—এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করেত নিখিলের মধ্যে তাঁকে জান্‌বে—আর ভোগ করবে কি? না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—তিনি যা দান করচেন তাই ভোগ করবে—মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং—আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে

যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তুমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জান্‌তে হবে। তা হলেই কি হবে? না, তুমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরো কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সে রকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি! তাহলেই অল্পই হবে বহু. তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড় করে কখনই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌছন যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং

অখণ্ড পাওয়া

আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে—এইটেই ঠিকমত জান্‌তে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না—এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষ ভাবে লোলুপ হয়ে উঠ্‌তে হয় না।

১৭ই চৈত্র

—

আত্মসমর্পণ

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেন না তিনি ত আপনাকে দিয়েই বসে আছেন—তাঁর ত কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা ত বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে অতএব আর একজায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ঐখানেই অভাব আছে—সেই জন্যেই মিলন হচ্চে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন আমরা আপনাকে দিইনি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহঙ্কারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র এমন কি বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এই জন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড় সত্তা বড় আনন্দ যদি কিছুই না থাকে তাহলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তাহলে ত আমাদের এই অহং এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই একেবারে পরম লাভ—তাহলে এ'কে আঁক্‌ড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন?

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা ক্ষমা

দ্বারা সন্তোষের দ্বারা সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্চিনে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্চিনে কেন? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্চে এই যে

"আমার যা আছে আমি, সকল দিতে
পারিনি তোমারে নাথ!
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
সুখ দুখ ভাবনা।"

দাও, দাও, দাও, সমস্ত ক্ষয় কর, সমস্ত খরচ করে ফেল, তাহলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে।

"মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত,
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।"

আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল

আপনাকে ঘোচাতে পারছিনে বলেই—সেইটে ঘুচ্‌লেই যে তৎক্ষণাৎ দেখ্‌তে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়—এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করিনে। এটা হচ্চে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে

প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাক্‌ত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাক্‌তেন, তাঁরই আনন্দ, শক্তিরূপে ছোট বড় সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করচে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করচি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করচি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজ করে তুল্‌তে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা, করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেন না যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম্ম স্বাভাবিক তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

১৮ই চৈত্র।

সমগ্র এক

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ যোগ-যুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে ? তা কখনই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেন না আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্চে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্চে—নইলে তার তৃপ্তি নেই।

জীবাত্মা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কি কি দেখচি।

প্রথমে দেখ্‌চি আমি আছি—আমি সত্য।

তার পরে দেখ্‌চি যেটুকু এখনি আছি এই টুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনো হইনি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারিনে ছুঁতে পারিনে কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

এ'কে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্ত্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্দ্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্য্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করিনি ভবিষ্যতে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে—যা চিন্তা

করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্চে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্ত্তমান—তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্য-মান যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখেনি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্চে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয় এর আর একটি ভাব দেখ্‌চি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করচে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করচে তা নয়,

এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখ্‌চে। এ এমন করে কাজ করচে যাতে আমাদের শরীরের "আজ"ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায়, শরীরের "কাল"ও আপনার দাবী রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাট্‌চে আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরচে। এই শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্চে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করচে, সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করচে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে

যাচ্চে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করচে, ধারণ করচে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা ত নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মত রক্ষাকার্য্য চলে যাচ্চে তা নয় এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে—সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিষ পাওয়া যায় একটি হচ্চে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জান্‌চে আমি হচ্চি আমি ; আমি হচ্চি একটি সম্পূর্ণ আছি।

শুধু জান্‌চে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে

সহ্য করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তাহলে দেখ্‌তে পাচ্চি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধ্‌চে, রাখ্‌চে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্চে।

তার পরে দেখ্‌তে পাচ্চি এই যে সমগ্রতা যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ সত্য কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্চে ও পরিণতি লাভ করচে তা নয়—তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখ্‌চি—ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখ্‌চি।

সমাজ-সত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্ত্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্ত্তমানে আবদ্ধ করচে না তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্চে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুল্‌চে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠ্‌চে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমময় যোগরূপে জাগিয়ে তুল্‌চে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জ্জন করচি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করচে; মানুষ অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করচে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি,

স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ ;—বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ দুর্ব্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গলরূপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দ-রূপে বিরাজ করচে। এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্ঝরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হয়ে চলেছে—কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এই জন্যেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে

সমগ্র এক

মিলন সে জ্ঞান প্রেম কর্ম্মের মিলন—সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিল্‌তে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিল্‌তে হবে—তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

১৯শে চৈত্র

আত্মপ্রত্যয়

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্য বুদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালবাসে।

শুধু তাই নয় এই জন্য সর্ব্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো না কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারিদিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে

আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে বুঝতে পারি, মানবকে এক বলে বুঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে বুঝতে পারি—এমন কি, সেই রকম এক করে যাকে না বুঝতে পারি তার তাৎপর্য্য পাইনে—তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাৎড়ে বেড়াতে থাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজচি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্য্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থাম্‌তে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্চে আমাদের আত্মা—মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্চে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্চে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্ বলে জানি তারও ভিত্তি

হচ্ছে এই আত্মা। এই জন্যই উপনিষৎ বলেন সাধক "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এই জন্যই পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে—অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি—আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ

এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্চে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

২১ চৈত্র।

ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্চে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং একেকেই আমরা বহুর মধ্যে সর্ব্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন কি, শিশু যখন নানা জিনিষকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার জন্যে চারিদিকে হাত বাড়াচ্চে তখনো সে সেই একেকেই খুঁজে বেড়াচ্চে। আমরাও শিশুরই মত নানা জিনিষকে ছুঁচ্চি, শুঁকচি, মুখে দিচ্চি, তাকে আঘাত করচি তার থেকে আঘাত পাচ্চি, তাকে জমাচ্চি এবং তাকে আবর্জ্জনার মত ফেলে দিচ্চি এই সমস্ত পরীক্ষা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত

দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই এককেই চাচ্চি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিল্‌তে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করচেন—আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখ্‌চি কিন্তু আমাদের আত্মা দেখ্‌তে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলি বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজ্‌চে আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজ্‌চে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজ্‌চে। নইলে সে কোনোখানেই

বল্‌তে পারচে না, ওঁ—বল্‌তে পারচে না, হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারদিকে মাথা ঠুক্‌তে থাকি উঁচট্‌ খেতে থাকি, তখন কত ছোট জিনিষকে বড় মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিষকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিষকে আঁকড়ে ধরে বলি এই ত পেয়েছি—তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্চি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—অমনি এতদিনের এত খোঁজা এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জান্‌তে পারি যে যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেক্‌ছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিষ নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন

তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বল্‌ল অমনি সব জিনিষ ছেড়ে দু' হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিষকেই একত্রে পাওয়া গেল—কোনো বিশেষ জিনিষ স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না—মাকে জান্‌বামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল—তখন যে জিনিষের ঠিক যে ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল—তখন জিনিষ-গুলো আমাকে অধিকার করলনা, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কি জ্ঞানে কি প্রেমে কি কর্ম্মে সেই একেকে সেই আসল জিনিষটিকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়—জিনিষের সমস্ত ভার এক মুহূর্ত্তে লাঘব হয়ে যায়।

সাঁতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়—তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাইনে—আপনি ভেসে উঠি। এই সাঁতারটি না জান্‌লেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায় ;—যে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জান্‌লে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার না জান্‌লে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে দুঃখ আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত পা ছুঁড়ে হাঁস ফাস্‌ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

আমাদের আসল জান্‌বার বিষয়কে পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না মারতে পারে না। তখন, পূর্ব্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মুক্ত ভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের

অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্ব্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ যে শক্তির অপব্যয় ছিল সেটা কেটে যায়।

সেই জন্যই উপনিষৎ বলেছেন—তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি—সেই সর্ব্বব্যাপীকে যাঁরা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্ব্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য্য লাভ করেন—আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলি বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না—তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন—তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন—নিজেকে কোনো অহঙ্কার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না—একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বহুর মধ্যে প্রবেশ করেন—সমস্ত বহু তখন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনুসরণ করব। সেই হচ্চে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্চে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ— জ্ঞান, প্রেম এবং কর্ম্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

২২শে চৈত্র

শক্ত ও সহজ

সাধনার দুই অঙ্গ আছে। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওয়া। এক জায়গায় শক্ত হওয়া, আর এক জায়গায় সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার দুটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্চে হাল, আর একটি হচ্চে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধরে রাখ্‌তে হবে। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জন্যে দিক্ জানা দরকার —নক্ষত্র পরিচয় হওয়া চাই—কোন্ খানে বিপদ কোন্ খানে সুযোগ সে সমস্ত সর্ব্বদা মন দিয়ে বুঝে না চল্লে চল্‌বে না। এর জন্যে অহরহ সচেষ্ট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্যে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর একটি কাজ হচ্চে অনুকূল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা! জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের সুযোগ হতে সে যেন লেশ-মাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তেমনি যেমন একদিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেষ্ট রাখ্‌তে হবে তেমনি আর একদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায় কিন্তু নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখ্‌তে পাই। এখানেও মানুষের যেন একটা কৃপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখ্‌তে চায়, ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন

নিজের শক্তির পরিচয় পায়—প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে, যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতখানি চলা হল ; এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করচি সমস্তই তিনি করচেন এইটি কল্পনা করা। করচি কাজ আমি, অথচ নিচ্চি তাঁর নাম, এবং দায়িক করচি তাঁকে—এমন দুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখ্‌তে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মান্‌তে হবে। কাৎ হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চল্লে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পূরাপূরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমুহূর্ত্তে যেন আপনাকে প্রসারিত করে রাখে। "কি ইচ্ছা, প্রভু, কি আদেশ—" এই প্রশ্নটিকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রেয় তা যেন

সহজেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্য্যন্তই তাকে নিয়ে যায়।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে আমি ধর্ম্মেই থাকি আর অধর্ম্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্চ আমি তেমনি চল্‌চি। এর ভাব এই যে আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্ম্মের দিকে নিয়ে যায় না অধর্ম্ম থেকে নিরস্ত করে না—তাই হে প্রভু, স্থির করেছি তোমাকেই আমি হৃদয়ে রাখ্‌ব এবং তুমি আমাকে যেদিকে চালাবে সেই দিকে চল্‌ব। স্বার্থ আমাকে যেদিকে চালাতে চায় সেদিকে চলবনা—অহঙ্কার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হবনা।

অতএব তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হোক্।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহঙ্কারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আন্‌তে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও—সকলের পিছনে এসে দাঁড়াও; সকলের নীচে গিয়ে বস—তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্ তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃত ফলভারে সার্থক হোক্। সর্ব্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ঐ একটুকথানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কি দরকার—তার কি মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বস্‌তে লজ্জা কোরোনা—সেই খানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হার-জিত তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মত কেবলি টলাবে কেবলি ঘোরাবে —প্রত্যেকটার পূরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে—তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে—তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে যে তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চ্চা যতই করি—ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন।

২৪শে চৈত্র

নমস্তেঽস্তু

কোন লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও যে সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধসূত্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন—যে রসের দ্বারা সেই সেই সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই;—এই জন্যে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মানুষ তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্চে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।

পিতা যত বড়ই হোন আর পুত্র যত ছোটই হোক্—উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক্ তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড় বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে—নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাক্‌বেন, আমাদের আপন হয়ে উঠ্‌বেন না।

তিনি ত কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশী—তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না—তা হলে আপন

কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ সূর্য্যকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে' এত লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব ঘুচিয়ে মাঝখানে রয়েচেন তেমনি তিনিই নিজে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের সম্বন্ধরূপে বিরাজ করচেন। নইলে একের সঙ্গে আরের ব্যবধান যে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাক্‌তেন তাহলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কি করে!

অতএব তিনি দুরূহ তত্ত্বকথা নন্ তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অখণ্ড আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্বাদে গন্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন—তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করে-ছেন—নইলে ফল নামক সত্যটিকে আমি

কোনোদিক থেকেই কোনো রকমেই এত-টুকুও নাগাল পেতুম না।

কিন্তু আপন যে কতদূর পর্য্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্য্যন্ত, তা তিনি মানুষের সম্বন্ধে মানুষকে দেখিয়েছেন—শরীর মন হৃদয় সর্ব্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেই জন্যে মানুষের এই সম্বন্ধগুলির মধ্যদিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্য-কালের আপন তিনি আমাদের কি? সেই তিনি তাঁকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না—তার চেয়ে চরমতর অন্তরতর কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু আমার প্রভু, আমার বিদ্যা, আমার ধন, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেববেদ। তুমি

আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড় সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড় সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্চে "পিতা নোঽসি" তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র—তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোট, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।

এই যে যোগ এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সম্পূর্ণ

সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, "পিতা নো বোধি" তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি ত "পিতা নোঽসি" পিতা আছ—কিন্তু শুধু আছ বল্লে ত হবে না—"পিতা নো বোধি" তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও!

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধি যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্চি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্চি "ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ" যিনি আমাদের ধীশক্তি সকল প্রেরণ করচেন। যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন—তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব! কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকুও পাই যে তিনিই দিচ্চেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্চেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছথেকে নিচ্চি,

পাচ্চি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারচিনে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্চিনে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, "নমস্তেঽস্তু"—তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়—সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে—আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কাররূপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর ; এ জলভারনত মেঘের মত, ফল-ভারনত শাখার মত রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্য্যে উপ্‌চে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য্য তা নয় এ প্রবল শক্তি।

এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে উদ্ধত অহঙ্কার তেমন করে পারে না। এঁকে কেউ পরাভূত করতে পারেনা। জীবন এই নমস্কারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জয়ী হয়। এই নমস্কারের দ্বারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্ত্তে লঘু হয়ে যায়—পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্ত্তকালীন বন্যার মত চলে যায় তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এই জন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি "নমস্তেঽস্তু"—তোমাতে আমার নমস্কার হোক্! সুখ আসুক দুঃখ আসুক "নমস্তেঽস্তু," মান আসুক অপমান আসুক নমস্তেঽস্ত—তুমি শিক্ষা দিচ্ছ, এই জেনে নমস্তেঽস্তু, তুমি রক্ষা করচ এই জেনে নমস্তেঽস্তু, তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে নমস্তেঽস্তু—তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই নমস্তেঅস্তু—অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের

অনন্তকালের অধীশ্বর তুমিই পিতানোঽসি, এই জেনেই নমস্তেঽস্তু, নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু, সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু, আমাকেই বড় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু! তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মত পরিত্রাণ লাভ করি।

২৯শে চৈত্র।

মন্ত্রের বাঁধন

বীণার কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইস্পাতের, কোনো তার মোটা, কোন তার সরু, কোনো তার মধ্যম স্বরে বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হবে—তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ সুর জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে।

সূর্য্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি, সকলেই এই বিশাল বিশ্বসঙ্গীতে নিজের একটা না একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে ;— মানুষের জীবনকেও কি এই চির-উদ্গীত সঙ্গীতে যোগ দিতে হবে না ?

কিন্তু এখনো এই জীবনটাকে তারের

মত বাঁধিনি—এর মধ্যে এখনো কোনো গানের আবির্ভাব হয়নি। এ জীবন সূত্রবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য সুরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে—তার মধ্যে নিজের মনের মত একটি কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিষটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মত—তারকে এঁটে রাখে—খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়—সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়—সেই মন্ত্র মনের মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের

প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্চে "পিতা নোঽসি।"

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্ম্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠ্‌বে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্ত্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করচিনে। আহার করচি কাজ করচি বিশ্রাম করচি এই পর্য্যন্তই। কিন্তু অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্চেনা। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয়নি।

ঐ মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক্। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে

ঐ মন্ত্রটি বারম্বার আমার মনের মধ্যে বাজ্‌তে থাক্ পিতা নোঽসি! জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক্ কারো কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশু ঐ সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলেনি—সে কেবলি বলেছে পিতা নোঽসি।

সেই যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে—যাতে আর ভাব্‌তে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে পিতানোঽসি!

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমত প্রকাশ করা বড় কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।

পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সন্তানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সম্ভত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুল্‌তে পারি তবে ত এই সুর বাজ্‌বে না যে পিতানোঽসি।

সেইজন্যেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হোক্‌—পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু!

২৭শে চৈত্র

প্রাণ ও প্রেম

পিতানোঽসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছথেকে গ্রহণ করব? যিনি পিতা তাঁর কাছথেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বল্‌ব, তুমি যে পিতা, সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও! আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দাও!

পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে ত কোনো তৈরি করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পর বোঝাপড়া আছে—সেই বোঝপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয় সে একেবারে আদিতম সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অস্তিত্বের মূলে। অতএব এই গভীর আত্মীয় সম্বন্ধ কোনো বাহ্য

অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না—কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্ম্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায়? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সন্তানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—"কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ?" প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে—যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই ত একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চল্‌চে সে ত কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া

রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ, এ'কে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্তই উপনিষৎ বলেছেন—"যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্" বিশ্বে এই যা কিছু চল্‌চে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্চে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমন—ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চল্‌চে, মন বাড়চে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্ত্তন হচ্চে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়—ঐ বর্ত্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে

নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্চে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত ;—সেই জন্যেই সর্ব্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধকারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত—প্রতিমুহূর্ত্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্য, ধীশক্তি লাভ করচি এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয় এই কথাটিকে ভক্তিদ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ঐ মন্ত্র সার্থক হবে—"ওঁ পিতানোঽসি।" আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বল্লে এত বড় কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, এ'কে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ

আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাটি নিজেকে ভাল করে বলাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্চে তা নয়—তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্চে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে—আমরা কেবল বেঁচে আছি কাজ করচি নয়, আমরা রস পাচ্চি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্ম্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা সুখ নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্চি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোট কারখানাঘরের সুরঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্চে?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে

আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করচেন, সেইজন্যেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করচে, আঘাত করচে, সচেতন করচে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায় জোয়ারের বেগের মত আমাদের মধ্যে এসে পড়চে এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি, "ওঁ পিতানোঽসি।" কেবলি তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্চেন এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—"কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষহ্যে-

বানন্দয়াতি।" কেই বা কিছুমাত্র শরীর চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন—এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্চেন।

২৮শে চৈত্র

ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতানোঽসি এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে। পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছে।

আর এক দিকে পিতা হচ্চেন বড়, পুত্র ছোট।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি কিন্তু স্পর্দ্ধা করতে পারিনে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে আমাকে মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেন না তিনি কেবলমাত্র আমার বড় নন তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়, আমি তাঁরই ছোট। তাঁকে

প্রণাম করে আমি আমার বড় আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই—জবরদস্তি নেই। যে বড়র মধ্যে আমি আছি, যে বড়র মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়—আমারই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহত্ত্ব অনুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে নমস্তেঽস্তু, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠুক্।

তাঁকে পিতানোঽসি বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধেব একটি পরিমাণ রক্ষা হয়—তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমত্ত হবার যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না—সম্ভ্রমের দ্বারা আমাদের আনন্দ গাম্ভীর্য লাভ করে, অচঞ্চল গৌরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানব-সম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন—মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থান দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও একদিকে যেন ওজন কম আছে, একদিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, তার রোগে শুশ্রূষা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাব নিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এই জন্যই সন্তানের আরাম ও সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এই জন্য তিনি সন্তানকে দুঃখও দেন—তাকে শাসন করেন—তাকে বঞ্চিত

করেন, যাতে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে কিন্তু সে স্নেহ সঙ্কীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেই জন্যে পিতাকে নমস্কার করবার সময় বলা হয়েছে নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—যিনি সুখকর তাঁকে নমস্কার যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্কার।

পিতা কেবল আমাদের সুখের আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন—সেই জন্যেই সুখেও তাঁকে নমস্কার, দুঃখেও তাঁকে নমস্কার। ঐখানেই পিতার পূর্ণতা; তিনি দুঃখ দেন।

উপনিষৎ একদিকে বলেছেন আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ হতেই যা কিছু সমস্ত জন্মেছে, আবার আর একদিকে বলেছেন

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ, ইঁহার ভয়ে অগ্নি জ্বলচে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিচ্চে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়—তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে—অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্চে ভয়—তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না—সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং—

এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্চে—সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চল্‌চে তিনি কি রকম? না, তিনি উদ্যত বজ্রের মত মহা ভয়ঙ্কর। সেই জন্যেই ত সমস্ত চল্‌চে—নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মত অতি নিদারুণ হয়ে

উঠ্‌ত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং এই ভয়ের দ্বারাই অনাদি কাল থেকে সর্ব্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে সর্ব্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্চে।

আমাদেরও যেদিকটা চলবার দিক্, কি বাক্যে, কি ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যখন বলি পিতা নোঽসি—তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে পিতানোঽসি সে তাঁর সাম্‌নে "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ" হয়ে থাকে সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধৈর্য্য ক্ষুদ্র আত্মবিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে চল্‌তে থাকে।

২৯শে চৈত্র

নিয়ম ও মুক্তি

সুখ জিনিষটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিষটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভাল তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভাল আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। কারণ সেই ভালই আমার পক্ষেও সত্য ভাল, আমার পক্ষেও নিত্য ভাল। যা বিশ্বের ভাল, তাই আমার ভাল কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভাল নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

নিয়ম ও মুক্তি

যেখানে বিশ্বের ভাল নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্য্যন্ত মান্‌তেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্‌ভয়ং বজ্র-মুদ্যতং। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব স্তুতি অনুনয় বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিষ হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিষ হবে তখনি সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনো নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়নি। এখনো চল্‌তে ফিরতে বাধে।

এখনো সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করিনে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এই জন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্চে না—পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করচি তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্চে না।

অর্থাৎ মঙ্গল এখনো আমার পক্ষে ধর্ম্ম হয়ে ওঠেনি। যার ধর্ম্ম যেটা, সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয় সেইটেই তার আনন্দ। চোখের ধর্ম্ম দেখা,—তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট; মনের ধর্ম্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম্ম হয়ে উঠ্‌বে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম্ম যেমন পুত্রস্নেহ ঈশ্বরের ধর্ম্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জগৎ চরাচরের ভাল করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে—সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম্ম ;—এই ধর্ম্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণ-পরিণত হয়ে উঠ্‌বার জন্যে নিয়তই মনুষ্য-সমাজে প্রয়াস পাচ্চে। আমাদের এই ধর্ম্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা দুঃখ পাচ্চি—পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠ্‌চে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনি তার

মুক্তি হয় যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ," ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মত ব্যবহার করবে।

তার কারণ কি? তার কারণ এই, যে পর্য্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাব-সিদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনি সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনি পিতাপুত্রের মাঝ-খানের আনন্দ সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত

হয়ে ওঠে। তখনি সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়,—তখনি পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়—তখনি, যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের দ্বন্দ্ববর্জ্জিত সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বিধাবর্জ্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়—তখনি আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শূন্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে, কর্ম্ম চলে যায় না, কিন্তু কর্ম্মই আসক্তিশূন্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

৩০শে চৈত্র

দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতানোঽসি বল্‌তে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে এই আকাঙ্ক্ষাটিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখা বড় কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাঙ্ক্ষা আছে, কত অসাধ্য সাধনের সঙ্কল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না; বাইরে থেকে যদিবা খাদ্য জোগাতে নাও পারি তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে আকাঙ্ক্ষা সকলের চেয়ে বড়, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায় তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি

আকাঙ্ক্ষা জিনিষটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—আমিই ইচ্ছা করচি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দ্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোট ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখেনা টাকা জিনিষটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভাল খাবে ভাল পরবে সেকথা তার মনেও নেই। কারণ বস্তুতই টাকার লোভে সে ভাল খাওয়া পরা পরিত্যাগ

করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্য কোনো সুখকে চাচ্চে না, অন্য সব সুখকে অবজ্ঞা করচে, সে টাকাকেই চাচ্চে।

এমনতর একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ, এই ইচ্ছা তার একলার নয়—সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্চে—কোনো-মতেই তার ইচ্ছাকে থামতে দিচ্চে না।

কোনো সমাজে যদি কোন একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ গৌরব থাকে তবে অনেক লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্য তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে—দশজনে এইটে আকাঙ্ক্ষা করে এই হচ্চে ওর জোর—আর কোনো তাৎপর্য্য নেই।

যে দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড় জিনিষ বলে জানে সে দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

অন্য দেশে এই দেশানুরাগের উপযোগিতা উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হোক্ না তবু দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ দেশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্চে না, পালন করচে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্ত্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড় ইচ্ছা। কিন্তু এতবড় ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এই জন্যেই। আমার চারিদিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করচে না। এর চেয়ে ঢের যৎসামান্য, এমন কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনো মতে নিবে যেতে দিচ্চে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই

সার্থক করে রাখ্‌তে হবে—দশ জনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে কৃত্রিম অর্থকে সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড় করে সত্য করে রেখেছে; সেই ইচ্ছা গুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টান্‌চে, আমার চেষ্টাকে কাড়চে; বুদ্ধিতে যদিবা বুঝি তারা তুচ্ছ এবং নিরর্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেল্‌তে পারিনে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় কিন্তু সে যখন আমারই ইচ্ছা আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জান্‌তেও পারিনে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এত বড় একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হবে এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথী করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই একদিনে শেষ হবে না—কিন্তু শেষ হবেই—জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, এর মধ্যে কোনো মতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশ জনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত খাঁটি হয়ে চল্‌তে হবে।

টাকা, বিদ্যা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে সে গুলোকে নিয়ে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে। অতএব আমি যদি

তার কিছু পাই তবে অন্যের চেয়ে আমার জিত হয়। এই জন্যেই সমস্ত উপার্জ্জনের মধ্যে এত ঈর্ষা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এই জন্যে লোকে এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার অর্থ বেশি, যার বিদ্যা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এই সকল জিনিষের দ্বারা মানুষ মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়—সুতরাং জিনিষে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে সেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয়। মানুষকে ঠকানও একেবারে অসাধ্য নয়—এই জন্যে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে—এই জন্যে ভিতরে যদি বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেই গুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের অগোচরেও এসে পড়ে—ঠাট বজায়

রাখবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করিনে, এমন কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিষকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা চালাতে পারে কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনফা কি হবে!

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্য স্বরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে জাল জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জান্‌বেন—মানুষকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোন্ দিন

জালদলিল বানিয়ে তাঁকে সুদ্ধ মানুষের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাক্‌ব। ঐখানে দশকে আস্‌তে দিয়ো না—নিজেকে খুব করে বাঁচাও! তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাঙ্ক্ষাটির দ্বারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা কর, এর দ্বারা মানুষকে ভোলবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, কারণ, ঈশ্বরের আসনে সবাইকে বসাবার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশ্বরকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখ্‌তে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সাম্‌লানো শক্ত হয়—মানুষ তখন মানুষকে চঞ্চল করে—তখন খাঁটি ভগবানকে চালাতে পারিনে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে

থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে—ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বল্‌তে পারব সেদিন পিতাই যেন সেকথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মানুষ যদি শুন্‌তে পায় ত যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

৩১শে চৈত্র

বর্ষশেষ

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্ব্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ঐ আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করচে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জান্‌তে হবে, নইলে, এই দুটিকে মিলিয়ে জান্‌তে পারব না।

সেই জন্যে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সম্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করচে—দিবসের শেষ মুহূর্ত্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়চে, আজ সায়াহ্নে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীর ভাবে জান্‌ব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জান্‌ব, যস্য ছায়ামৃতম্‌ যস্য মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড় সুন্দর বড় মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড় কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে, তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মত কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময়

করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণ স্থিতিকে বিচলিত করে।

আসক্তির মত নিষ্ঠুর শক্ত কিছুই নেই; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে না, সে কারো জন্যে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্চে জীবনের ধর্ম্ম; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করচে।

ত্যাগ বড় সুন্দর, বড় কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠ্‌তে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য্য। মৃত্যুই পরিবেষণ করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড় হয়ে উঠ্‌তে চায় তাকে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা

কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই, এই বিষাদের ছায়ায় সর্ব্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে—চারিদিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে কাঁদিয়ে তুলেছে। এই বিদায়ের সুরটি যখন কানে এসে পৌঁছয় তখন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়—তখন বৈরাগ্য নিঃশব্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানিনে। দুর্গতি একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা হয়েই উঠ্‌ত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরচে এবং সেও সরচে সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল

একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগচ্চে। আমরা সব সময়ে দেখ্‌তে পাইনে কিন্তু সে চল্‌চে—ঐখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্ত্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকত তাহলে সেই স্থিরত্বের উপর রুদ্রের অসীম শাসন দণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড ত তাকে এক জায়গায় চেপে রাখ্‌চে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলি মার্জ্জনা করচে, কেবলি ক্ষমার অভিমুখে বহন করচে।

আজ বর্ষশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না? যার উপরে মরণের শিলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিষ তাকে কি আজো আমরা যেতে দেব না! বছর ভরে যে সব পাপের

আবর্জ্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বৎসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্ম্মল হয়ে নব বৎসরে প্রবেশ করতে পাব না?

আজ আমার মুষ্টি শিথিল হোক! কেবল কাড়ব এবং কেবল মারব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাইনি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সম্মুখে এসে, ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক! আজ তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়্তে সম্পূর্ণ মর্‌তে এক মুহূর্ত্তে পারব না; তবু ঐ দিকেই মন নত হোক্—নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্জলি প্রসারিত করুক্—সূর্য্যাস্তের সুরেই বাঁশি বাজ্‌তে থাক্, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক্—নববর্ষের ভার গ্রহণের পূর্ব্বে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সর্ব্বভার-মোচনের সমুদ্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি—নিস্তরঙ্গ

নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই, বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে স্তব্ধ হই শান্ত হই, পবিত্র হই।

৩১শে চৈত্র

নববর্ষদিনে যাহা বলা হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগ ঘটে নাই।

অনন্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্চে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা। সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করচে। সে, ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করচে তা আমরা জানিইনে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই—তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার

অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করচে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এই-টিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব বলে আবদার করচে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্চে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্চে,

সকলেই জিৎতে চাচ্চে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি কত যুদ্ধ কত দলাদলি চল্‌চে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে—তাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্চে না—কিন্তু সে আছেই, না থাক্‌লে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না—সে হচ্চে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হোক ভাল হোক্ এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে—এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা

করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড় বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড় বিদ্যায় বড় খ্যাতিতে বড় হয়ে নিজেকে বড় জান্‌তে চায়। এর জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইচে। সকলের বড়, যিনি অনন্ত অখণ্ড এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড় ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে

একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্চে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্ত্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে—শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ঐ মঙ্গলইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্ত্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেই সকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়—অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্ম্মকে কেবলি আকর্ষণ করচে;—সে যেখানে গিয়ে পৌঁছচ্চে সেখানে গিয়ে থাম্‌তে পারচে না—কেবলি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল, এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করচে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সঙ্গত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা—কোনো বর্ত্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়—সে ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম এইজন্যে সে তাঁরই দিকে আমাদের টান্‌চে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কি শরীরে, কি সমাজে, কি আত্মায়, সর্ব্বত্রই আমরা এই যে দুটি ইচ্ছার

ধারাকে দেখ্‌তে পাচ্চি, একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্ত্তনশীল—আর একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন, একটি কেবল বর্ত্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী, একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত—এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ কর, এর তাৎপর্য্য গ্রহণ কর। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করচে সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্যই সমস্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত কর।

৩রা বৈশাখ

পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না—অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেই জন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেটভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়;—দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্ব্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে সুখের প্রতি যতই

লোভ থাকুক্ মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে সৌন্দর্য্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেল্‌তে পারিনে—যা বীণার অনুরণনের মত চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করিনে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মত পাওয়া তাকেই বলি যে পাওয়ার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা আছে। যে জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর, তার মূল্য অতি অল্প—কেন না, সেটা একটা সঙ্কীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না—যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা

অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে—যা কেবল ঘটনাবিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্ত-রূপে বিরাজমান সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি—আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয় কোনো এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাইনে। তার সঙ্গে যে সময়ে যে আলাপে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি, সে সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্ম্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারিনে—সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ

অপ্রাপ্ত—এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্চে তা নয় সে না পেতেও চায়। এই জন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বল্‌চে কেবলি পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম—আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি ;—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ক্ষুদ্র ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন "অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্"—যিনি বলেন আমি তাঁকে জানিনি তিনিই জানেন, যিনি বলেন আমি জেনেছি তিনি জানেন না।

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখী যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই—পাখী আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ—এই জন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়—কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখী আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ—ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেন:—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"—আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানিনে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একে-বারেই জান্‌তে চাই—যেমন করে এই সমস্ত জিনিষপত্র জানি নইলে আমার কিছুই হ'ল না।

আমি বলচি আমরা তা চাইনে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিষপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখী যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হ'ল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টীকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সঙ্কটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠ্‌ছিল। একজন বল্লে, ঐ যে, ঐ আলোতে টীকা ধরাব। ব'লে টীকা নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে

বাড়িয়ে ধ'রলে। টীকা ধ'রল না। তখন আর একজন বল্লে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে! বলে সে আরো কিছু দূরে গিয়ে টীকা বাড়িয়ে ধরলে—এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টীকা ধ'রলনা।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্চে এই, যে, যে ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্চে কারো কারো মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিই চাই—টীকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ঐ চাঁদের কথা ভাব্‌লেই বোঝা যাবে। আমরা দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাইনে—চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই—চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের

অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সব চেয়ে বড় চাওয়া। সেই জন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠ্‌লেই নদীতে নৌকায়, ঘাটে, গ্রামে, পথে, নগরের হর্ম্ম্যতলে গাছের নীড়ে চারিদিক থেকে গান জেগে ওঠে—কারো টীকেয় আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম ত তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার—আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উল্টো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। যে জিনিষ আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহঙ্কারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিষ আমার ভৃত্য আমার অধীন—আমি তার চেয়ে বড়।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সব চেয়ে বড়

সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড় তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্চে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম! গেল আমার অহঙ্কার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেরে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ ত সমাপ্ত নয়—সে ত হয়ে বসে যায়নি—সে যেটুকু হয়েছে সে ত অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়—তার বর্ত্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্ত্তমানকেই

চাচ্চে। কিন্তু সে ত কেবলি বর্ত্তমান নয়—সেত কেবলি হওয়া রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্চে খাদ্য দিচ্চে। এই জন্যেই মানুষ কেবলি বলে অনেক দেখ্‌লুম, অনেক শুন্‌লুম, অনেক বুঝ্‌লুম—কিন্তু আমার না-দেখার ধন, না শোনার ধন, না বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না—যাকে পাইনে বলেই হারাইনে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদ্‌চে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

৪ঠা বৈশাখ

হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে ত কেবল প্রয়োজনের মতই পাই তার বেশি ত পাইনে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এই রকম বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেই জন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ঐ রকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ—তাঁকে

দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বল্‌তে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়—তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত—তিনি আমাদের বিষয় সম্পত্তি নন্‌!

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া—পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলি হয়ে উঠ্‌তে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলি হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া—সে ত লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বল্‌বে, বল কি! তুমি ব্রহ্ম হবে! এমন কথা তুমি মুখে আন কি করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আন্‌তে পারিনে—আমি অসঙ্কোচেই বল্‌ব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড় স্পর্দ্ধার কথা বল্‌তে পারিনে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাৎ নেই? মস্ত তফাৎ আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্চে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠ্‌ছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চল্‌চে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলি বল্‌চে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্দ্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্চে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত ক্ষেত কত সহর কত গ্রাম কত বন আছে

হওয়া

তার ঠিক নেই—নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারেনা। এই সমস্ত সহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও সহর গ্রাম বন হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোট সচল জল সেই বড় অচল জলের একই জাত। এই জন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ঐ বড় জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহ্বরে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে না—যদি কোনো ছোট জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মত বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি

তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলাটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেন না সে সমুদ্র হতে চাচ্চে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্চে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারিনে। আর কোনো হওয়াতে ত আমরা সম্পূর্ণ হইনে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই ; পেরতে পারিনে ব্রহ্মকে। ছোট সেখানে বড় হয়। কিন্তু তার সেই বড় হওয়া শেষ হয়না—এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে, হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহঙ্কার, স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকাল বেলায় এইখানে বসে যে একটু-খানি উপাসনা করি এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিষটিকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনদিন জম্‌চে কোনোদিন জম্‌চেনা বলে খুঁৎ খুঁৎ কোরো না—এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা কোরোনা। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা কর—উল্টোদিকে নয়, নিজের দিকে নয়—কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মত তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলি তিনিময় হতে থাকবে, কেবলি তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠ্‌বে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জান্‌তে

পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ই বৈশাখ

মুক্তি

এই যে সকাল বেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিষকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ এই জন্যে সে সমস্ত জিনিষকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখ্‌তে যাইনে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখ্‌তে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেল্‌লেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই

সেই অভাবনীয়কে দেখ্‌তে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ, "আনন্দরূপমমৃতং" ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে

দেখা। যেখানে তা না দেখ্‌বে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছিনে।

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো—যা-কিছু দেখ্‌ছি এ'কেই সত্য করে দেখানো—নূতন কিছু তৈরি করা নয় কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্চে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার মোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়; পাপ স্বার্থ, অহঙ্কার, জড়তা মূঢ়তা ও

সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি এ'কেই সত্য করে দেখা, যা করচি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্ত স্বরূপেই আনন্দিত তাহলে তাঁর সেই অব্যক্ত স্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকৃত না। কিন্তু তা ত নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে ত হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর

মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব? তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ

করাই হচ্চে মুক্তি। কর্ম্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্ম্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করচেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম্ম করচেন তেমনি আনন্দেই কর্ম্মকে গ্রহণ করা এ'কেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জ্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অভ্যস্ত পৃথিবী আমাব কাছে জীর্ণ, অভ্যস্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে

রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখ্‌তে পায় তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ঐ অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ—কিন্তু আমরা রূপকে দেখ্‌চি আনন্দকে দেখ্‌চিনে—সেই জন্তে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করচে—আনন্দকে যেমনি দেখ্‌ব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবেনা। সেই ত মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়—সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।

৭ই বৈশাখ

মুক্তির পথ

যে ভাষা জানিনে সেই ভাষার কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলি আমার কানে ঠেকতে থাকে—সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তখন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে—তখন তাকে কাব্য বলে বুঝ্‌তে পারি ভোগ করতে পারি।

বালক যখন কোনো দুর্ব্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন কাব্য পাঠ বন্ধ করে তাকে যে মুক্তি দেওয়া যায় সে মুক্তির মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে

তুলে তাকে যে মূঢ়তার পীড়া হতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, চিরন্তন মুক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি, জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়—তবে বিশ্ব-কবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বল্‌ব।

কিন্তু এই কাব্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করার চেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্যন্ত কোনো দেশের মানুষ সমুদ্র সেঁচে ফেলবার চেষ্টা করেনি—তারা সাধ্যমত নৌকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্ব প্রকাশের রূপের মধ্যে যখন আনন্দকে দেখ্‌ব কেবলই রূপকে দেখব্‌না তখন রূপ আমাকে আর বাধা দেবেনা—সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয় আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয় ভাষা তখন নিজের সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে—ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মুগ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না—এটা নিজের

ভিতর থেকেই বুঝতে হয়। যে ভাষা জানিনে কেবল মাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনো কালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোখ কান সেখান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যখন একবার ভিতর বুঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের ঊর্দ্ধ দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দ প্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারিনে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জান্‌তে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই—তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি সে বিশ্বেও সর্ব্বত্র মূঢ়তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এম্‌নি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে আনন্দ না থাকে তবে বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা—প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃ-

তিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করচে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গল সাধনাই আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়—সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়—সে অতীতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্ব্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্ব্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনি প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। এ'কেই ত বলে মুক্তি।

বুদ্ধদেব শূন্যকে মান্‌তেন কি পূর্ণকে মান্‌তেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে।

কিন্তু তিনি মঙ্গল সাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল, স্বার্থত্যাগ, অহঙ্কারত্যাগ, ক্রোধত্যাগের সাধনা—ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এম্‌নি করে প্রেম যখন অহংএর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাওনা কেন সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেইই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে—নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্চে,—পাপপরিশূন্য মঙ্গল সাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে

থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্ম্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক থেকেই জগৎকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে—মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমা-দের কাছে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

৭ই বৈশাখ

শান্তিনিকেতন

(নবম)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।০ আনা ।

প্রকাশক

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস

২২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কান্তিক প্রেস

২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

সূচী

শান্তিনিকেতন

আশ্রম

(শান্তি নিকেতনের বাৎসরিক
উৎসব উপলক্ষ্যে)

প্রভাতের সূর্য্য যে উৎসব দিনটির পদ্মদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্ম্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণবেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছয় নি? এই বিশ্ব উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই

চিত্তমধুকর কি আজও এখনো জাগ্‌ল না? কোনো বাতাসে এখনো সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে, দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই! কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না—আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা কর, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা

শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে—সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কি নিয়ে, কিসের জন্যে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরচে—সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ—সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরচ্চে না—সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি তবে দেখ্‌তে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্চে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-

বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফল্‌চে ; এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্যে ফল্‌তেই চল্‌বে।

বহুকাল পূর্ব্বে কোন্‌ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর ক'জন লোকই বা জান্‌ত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘট্‌ল এবং আজ্‌কেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেল্‌তে পারেনি। সেই একটি দিনের মধ্যেই এ'কে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তারপরে বহুকাল পর্য্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসব ফল প্রসব করচে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্চে কিন্তু চিরপ্রাণ ত তাদের স্পর্শ করে না—তারা ঘট্‌চে এবং মিলিয়ে যাচ্চে তার হিসেব কোথাও থাকৃচে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্ত্তটিকে কথন্ লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান—তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জ্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক—সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেথ না থাকুক্—কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে—নিত্যকালের সূর্য্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে—সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর

ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন—তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয়নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠ্‌চে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও! তাঁর সেই

প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি ত আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্ব্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে, এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দ্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই—তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের

মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্চে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখেনি তারা অহংকেই বড় করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত— একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহঙ্কার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহংয়ের দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহংয়ের আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই ত নিজের প্রচুর তেল ও পলতের

সঞ্চয় নিয়ে গর্ব্ব করে—আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পল্‌তের দিকে ফিরে তাকায়? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পল্‌তে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাক্‌তে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ম্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহঙ্কারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো

ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। সে ত কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্যই তার বাক্য ও কর্ম্ম নিত্য হয়ে ওঠে—তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে, যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে' আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল—তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল—এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে

দিয়েছে—এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তি-নিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন এ'কে সৃষ্টি করে তুল্‌চে।

তিনি আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জান্‌তেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জ্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে জায়গায় বড় এসে দাঁড়ান সে জায়গাকে ছোট বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে—তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না—এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে,—এ আপনিই আজ

আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূত-ভব্যস্য, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্চে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারত-বর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং" আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোন অতীতকালের জিনিষ

হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগ-সাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয় তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না—মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব—এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড় করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব—পরস্পরকে খর্ব্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলা-ঠেলি করতে থাকব—সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতংরূপে বিরাজ করচেন তাঁকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ, না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্চে অসতোমা সদ্‌গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা-মৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে; এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ঈশানো ভূতভব্যস্ত এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড় আসন পেতে-

ছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করচে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্ম্মল করে দিচ্চে—সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সঙ্কোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্চে—তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্চে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, তাদের ধৈর্য্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠচে—এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত

হচ্চে—এবং যে জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দ ধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তর-ধারায় দিক্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্চে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুন্‌তে পাচ্চে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য-ময় সৃষ্টির কাজ চল্‌চে সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্চে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকা-শের মধ্যে নির্ম্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলি বিকীর্ণ করচে—কেবলি বলচে তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্চে না—সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে,

সৃষ্টির শক্তি ত আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ সম্মিলন ত শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করচে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে—এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্চে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত্ত এখানকার সূর্য্যোদয়কে, সূর্য্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মত অনির্ব্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুল্‌চে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে 'যেতে

এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন—সেই দিনটি আর ময়লনা—সেই দিনটি বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি-শক্তির মধ্যে চিরদিনের মত আট্‌কা পড়ে গেল, শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুল্‌তে লাগল—যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্ত্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, এই যে আশ্চর্য্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্ম্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মান্‌তে চায় না তখন সেই

অপর্য্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃত বর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকী-কুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্য্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্ব্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য, একটী পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফল পুষ্প পল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করচে না?

নিশ্চয়ই করচে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড় রহস্য নিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে—এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে—যেই এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ যে ইনি ইঁহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সমুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সাম্‌নে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দ গান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুল্‌বে না? না, তা কখনই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও

ফিরবে, পাষাণ হৃদয়ও গল্‌বে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধি-দেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে—সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারিদিকের গাছ-পালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না—তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানিনে; তোমার সূর্য্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করচে যদি গণনা

করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানিনে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করচে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সাম্‌নে নানা রঙের ছবি আঁকচে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করচে, যা বল্‌চে "আমি জল," বলে, আমাদের স্নান করাচ্চে, যা বল্‌চে আমি স্থল বলে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জান্‌তে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি; তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন তস্থৌ বিজু-

গুপ্সতে—তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সকল সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে—কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্ত্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখ্‌তুম, কানে শুন্‌তুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে

ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে ত কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি ত অচেতনভাবে হবে না, সেটি ত মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্ম্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয় এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয়। যে সাধক আত্মার-শক্তিকে জাগ্রত করে' আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে; সে এমনি

পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্ম্মল করব, আমরা আজ যথার্থ ভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্ম্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে

তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে থাকবে।

৭ই পৌষ, প্রাতঃকাল ১৩১৬

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি—সেটি সহর। উন্নতির সূর্য্য যতই মধ্যগগনে উঠচে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়চে। চুন সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারচে না।

এই সহরেই মানুষ বিদ্যা শিখচে, বিদ্যা প্রয়োগ করচে, ধন জমাচ্চে, ধন খরচ করচে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুল্‌চে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুতঃ এছাড়া অন্য রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত

হয়ে ওঠে—এবং চারদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সার পদার্থ সকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্য্যে সর্ব্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্চে সহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় সহর সৃষ্টি করে বসে তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হোক্, অনেকে একত্র হবার

একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘট্‌তে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ সহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠেনি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল,—ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে সব মানুষ অবস্থা-গতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয়, তারা বাঘের মত হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মত নির্ব্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জ্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করেনি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটেনি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগেনি এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানতঃ বহিরভিমুখী হয়নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের

গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে—নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্য্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয়নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জ্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ্ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অন্নস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে—এমনি করে এক একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্য্যাবর্ত্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোক আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে সমস্ত সম্পদ্ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত

মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে, ধ্বনিতে ও রূপ-বৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারি মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন; সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বল্‌তে পেরেছিলেন—"যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং" এই যা কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্চে। তাঁরা স্বরচিত ইটকাঠলোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না—তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে,

কুশসমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম্ম, অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জান্‌তে পেরেছিলেন। চতুর্দ্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জ্জীব বলে, পৃথক বলে জান্‌তেন না। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জান্‌তে পেরে-ছিলেন—সেইজন্যেই নিশ্বাস, আলো, অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে

আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে নিগূঢ়-প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড় বড় প্রাচীনযুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সে দুইযুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন্, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন—রাজ-প্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায়নি—বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য, সাম্রাজ্য, নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে—দেশ বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য আদানপ্রদান চলেছে—অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্য্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ

বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করেনি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশী সম্মান দিয়েছে—এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারত-বর্ষের পুরাণ কথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড় বড় রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করেনি কিন্তু নানাবিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্য্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব ইতিহাসে এইটেই হচ্চে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি—তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে।

তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি—তখন, চীন, হুন, শক, পারসিক, গ্রীক্, রোমক্, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে—তখন জনকের মত রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করচেন, অন্য দিকে দেশ দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্চেন এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিন-কার ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবন চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্ত্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনি উদ্‌ঘাটিত

হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসচেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করচে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মত; তারা নীবার ধান্তের অংশ পায় এবং নিঃসঙ্কোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনি-কন্যারা গাছে জল দিচ্চেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠ্‌চে অমনি তাঁরা সরে যাচ্চেন,—পাখীরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করচে। আহুতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্ব্বশরীর পবিত্র করে দিচ্চে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা এই হচ্চে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করচে তারও মূল সুরটি হচ্চে ঐ,—চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখচেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করচে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করচে, কুটীরের অঙ্গণে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে; সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে—বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করচে, অরণ্য-কুক্কুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহার করচে;

নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্চে,—হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করচে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্চে ঐ।—তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্চে, এই পুরান কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে-তাই না কি প্রধানত নাটকের উপাদান এই জন্যেই অন্যদেশের সাহিত্যে দেখ্‌তে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্য্যন্ত খ্যাতি

রক্ষা করে আস্‌চে তাতে দেখ্‌তে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলি একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জ্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করচে অথচ দেখাচ্চে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র—এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের

সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখ্‌চে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্ব্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচাবয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ তরুণীর যে মিলন সঙ্গীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নীচের সপ্তক থেকেই সুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মত তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয়নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝঙ্কৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্রমুখরিত নিদাঘ-দিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত; আপক্কশালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী

তাঁর হংসরব-নূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্দ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্ম্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে সেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখ্‌লে তার অত্যুগ্রতা থাকে না—সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে দেখ্‌লে তাকে ব্যাধির মত অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখ্‌তে হয়। শেক্সপিয়রের দুই একটি খণ্ডকাব্য আছে নর-নারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়;—কিন্তু সেই সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত,—তার চারদিকে আর কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই—এইজন্যে সেসকল কাব্যে প্রবৃ-

ত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্চে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্ব্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পাননি। আতসকাচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্রে সূর্য্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে—কিন্তু সেই সূর্য্যকিরণ যখন আকাশের সর্ব্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্ত-প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্ব্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্ব-সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজাননি; যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর

ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মত বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্ত্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজে জীবনযাত্রায় যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখ্‌লে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সঙ্গীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণ-বহুল সম্ভোগের সুর যে বাজেনি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্য্যে খচিত হয়ে ছিল। এই রকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখ্‌তে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্য-

বিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় ত তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলি মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্য্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্ম্মল সুদূরকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্য্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়।

বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয় সেবা ছিল, বার্দ্ধক্যে যাঁরা মুনি-বৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের

দেহত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্ত্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্ত্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কি? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজ-প্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীর তেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করে-ছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার

ধন। আবার যে ভরত বীর্য্যবলে চক্রবর্ত্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তা'কে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্য্য গৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদ-ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে—কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্ব্বনাশ করে সেও ত কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে

দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতি-প্রকটবর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গল-জটাধারী ঋষিবালকের মত পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তা-পাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয় বার্তায় জগৎকে উদ্বোধিত করে তোলে—কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধতেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মি-চ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই

বাক্যহীন কর্ম্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ জ্যোতিষ্কের নির্ব্বাপন বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলচেন, ছিল কি, আর হয়েছে কি! সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য্য আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্চে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণ-রাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্চে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো

হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকল প্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধি-মগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়—আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠ্‌লেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সঙ্কীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহঙ্কারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড় করে তুল্‌তে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই

ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহঙ্কারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে—আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্ব্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্চে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ—কিন্তু শিব হচ্চেন সকল দেশের সকল কালের—কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘট্‌তেই পারে না।

"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের

মর্ম্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা—লাভ করবার জন্মে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিষ, মানুষের জীবন গঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড় রাসায়নিক শক্তি; এরদ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করচেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া

উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বল্‌চেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। "যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" অর্থাৎ যা কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন—এইটেই হচ্চে তপোবনের সাধনা। এই জন্যেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয় সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্যদেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এই জন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব

করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্ব্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বল্‌তে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্ব-জনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, তপোবনের মিলন হচ্চে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেচেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্চে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার

সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনি শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য্য অগ্নি বায়ু জল স্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দ্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শান্তরসের সঙ্গীত বাঁধা হয়েছিল এই সঙ্গীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপো-বন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে

একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠ্‌ছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশ-সূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন; এই তপোবনটি দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেঘের মত কিম্পুরুষ পর্ব্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন,—লতা-জালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্য-জটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মত সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে

ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদ-দুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃত-লোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্চে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্চে যেমন-হওয়া ভালো। এই "যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে "যেমন-হয়ে-থাকে" চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করচে, পূর্ণ করচে। "যেমন-হয়ে-থাকে" হচ্চেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর "যেমন-হওয়া-ভালো" হচ্চেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও "যেমন-হয়ে-থাকে" তপস্যার দ্বারা

অবশেষে "যেমন-হওয়া-ভালো"র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস লোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেনি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড় হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ—অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্ব্বতের পর পর্ব্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেননি। এই সমস্ত নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল—এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্ত্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না।

সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্য্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্য্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করেনি। ধর্ম্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেননি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলি আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে সকল তরুগুল্ম কিম্বা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্ব্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন—তিনি

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ—

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বল্‌চেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্চে না, সুহৃদ্‌গণের কাছথেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্চে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্য্যমণ্ডলের মত দুর্দ্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্ব্বভূতানাম্। ইহা ব্রাহ্মীলক্ষ্মী

দ্বারা সমাবৃত। কুটীরগুলি সুমার্জ্জিত, চারিদিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল—সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহন-

তার রহস্যকে একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের As you like it নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেষ্ট্‌ও তাই, Midsummer night's dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সেসকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য দেখ্‌তে পাইনে; অরণ্য-বাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটেনি—হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্ব্বদাই রয়েছে,—হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্ট্‌ কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও

মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করচে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাইনে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্য্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করচেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় সম্মিলিত করে তুলচেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none ; such was their awe of man." অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জান্‌বে —এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্ত্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করচেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্ব্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্চে এই যে মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে! সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয় সে মিলন

চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্ত্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্য্যবেগে চারিদিকের জল-স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন "যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে" তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্ব্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করে-ছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে সকল গাছ পাখী ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণগলার মত গলে যাচ্চে।

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করচে না। বিরহ-দুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-অরণ্যনগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়-

বেদনাকে কবি সঙ্কীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন ; এই জন্যই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্ত্তা চির-কালের মত বর্ষাঋতুর নর্ম্মস্থান অধিকার করে' প্রণয়ী-হৃদয়েব খেয়ালকে বিশ্বসঙ্গীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্চে বিশেষত্ব। তপ-স্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়-বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখ্‌তে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর এক, মিল-নের মধ্যে। এক, ভোগের দ্বারা, আর এক, যোগের দ্বারা ; ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এই জন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য্য বা মহিমার আবির্ভাব সেই খানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে

পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই—এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না—এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্তত সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়—এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে' আত্মাকে সর্ব্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে এই জন্যেই তা পুণ্য স্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয় সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আস্‌চে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ

বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্ব্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুল্‌চে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্য-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব্ব করেনি— তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয়নি ; এই বিশ্ব-

প্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করচে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি, উপাধিও পায় অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিষকে দেখ্‌বে না, পাবার জিনিষকে নেবেনা, শেষ পর্য্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে, এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে

নির্ব্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জ্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারিনে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটি সংখ্যক পূর্ব্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্‌গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড় জিনিষ বলে শ্রদ্ধা করিনে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে

সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জ্জনা করে দিচ্চে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এই জন্যে প্রত্যহই নানা কর্ম্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে —যে লোক চেতন ভাবে তাই স্মরণ করতে

পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধ শক্তি স্বীকার করতে পারে সে লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না; কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্চে জড়তা—তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলি ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে একথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্য মাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া

যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখিনে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়—তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিষ বলে দেখি তবে কখনই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারিনে—তবে প্রাণ জিনিষটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমোদের অঙ্গ হয়ে ওঠে—এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্ব্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কি? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্ব্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্চে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল— সে দেখ্‌ছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট্ বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান, অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে—এই হচ্চে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়—বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

> ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ,
> মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃপরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্চেন তিনি।

ইন্দ্রিয় সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ সাধন হয়—কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর—কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময়

যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ!

এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখ্‌তে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানায় দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়—আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে

কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা। বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে সকল পূর্ব্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড় এবং দূরে আছে বলে ছোট, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখ্‌লে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখ্‌লেই সার্থক তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্চে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠ্‌লে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিষকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিষটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই; লোভের জিনিষকে আমরা বড় দেখি

সে জিনিষটা সত্যই বড় বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্তে ব্রহ্মচর্য্যের সংযমের দ্বারা বোধ-শক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক—ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচার-বুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চল্‌চে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্ম্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেই খানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠ্‌বেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানবিহীনের দুরাশা মাত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই

স্বীকার করতে পারিনে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়—সেই জন্যেই তার সাধন চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্চে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিষটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করিনে যে টাকা উপার্জ্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি—তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠ্‌বে।

বর্ত্তমানকালে এখনি দেশে এই রকম

তপস্যার স্থান, এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতর আশা করিনে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্দ্ধে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বল্‌তে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারিনে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা

করিনে এইটেই হচ্চে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, এইটিই হচ্চে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্ব্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানাদিক্‌কে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়াম চর্চ্চা নয়। যোগ-সাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্য্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসঙ্কুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয়-দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ড সকলকে অনুবর্ত্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্ব্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছয়নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড় বড় সহর

ইন্দ্রজালের মত জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে সহরের সৃষ্টি হয়নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয়নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্ব্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়; ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠেনি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয়নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড় জিনিষ কিছুই দেয়নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড় পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে যুক্ত করেনি

তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয়নি। নগর নগরাই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই নগর স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে; আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তাল গাছের মত একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মত অসংখ্য ডালে পালায় আপনাকে চারদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়।

তার যে শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্ম্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মত ছাঁচে ঢালবার জিনিষ নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্ত্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুসি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোট পা সৌন্দর্য্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সঙ্কুচিত করে চীনের মেয়ে ছোট পা পায়নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত

করতে গেলে প্রকৃত যুরোপ হবে না বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

একথা দৃঢ়রূপে মনে রাখ্‌তে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিষের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিষটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চল্‌তে পারে না, তাহলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে, যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ

আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কি। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারত-বর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে, বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্ব্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্চে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্ম্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দুমুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা

করচে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিক-ভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক্‌ থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্ব্বজীবে দয়া, সর্ব্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিলনা; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে এ'কে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি—তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে

স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড় মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে—এই যোগ অহঙ্কারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্ব্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি—এই জন্যেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না, এই জন্যেই ঝড় কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে—আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না,

আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথিবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

ছুটির পর।

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে)

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর লই সে কর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্ম্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে যদি এই রকম দূরে না যাই তবে কর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য আমরা বুঝতে পারিনে। অবিশ্রাম কর্ম্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্ম্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম্ম তখন মাকড়সার জালের মত আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকেনা। এই জন্য অভ্যস্ত কর্ম্মকে পুনরায়

নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্ম্মকেই দেখবনা। কর্ত্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার কারখানার মুটেমজুরের মতই সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুল মেখে দিন কাটিয়ে দেবনা; একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলি কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই সামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছি। এবার কি আবার

নূতন দৃষ্টিতে কর্ম্মকে দেখছিনা ? ঐই কর্ম্মের মর্ম্মগত সত্যটী অভ্যাস বশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্চেনা ?

এ আনন্দ কিসের জন্যে ? এ কি সফলতার মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে ? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি ? এ কি আমাদের আত্মকীর্ত্তির গর্ব্বানুভবের আনন্দ ?

তা নয়। কর্ম্মকেই চরম মনে করে তাহার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্ম্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্ম্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্ম্মের চেয়ে বহুগুণে বড় জিনিষটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহঙ্কার দুর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের

আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকে দেখিনা।

এখানকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র? কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড় করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড় ফল বলে গর্ব্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গল কর্ম্মের উপরে সেই বিশ্ব-

মঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গল কর্ম্ম সেই বিশ্ব-কর্ম্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না—নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জন্যই কর্ম্ম—নইলে কর্ম্মের মধ্যেই কর্ম্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্ম্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা তা হলে কর্ম্মের মধ্যে যা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কর্ম্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে—কারণ, কর্ম্মফলের চেয়ে আরো যে বড় ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম

করলে আমরা কৃতকার্য্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না—বস্তুত কৃতকার্য্য হব কি না তা জানি নে—কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়—তাতে আমাদের তেজ ভস্ম-মুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও, যে, কর্ম্মে বাধা আছে—আনন্দিত হও, যে, কর্ম্ম করতে গেলেই তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারম্বার তার পরাভব ঘটবে, আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে—আনন্দিত হও, যে, তুমি যে বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারম্বার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই ত সাধনা। যে ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায়, সে ব্যক্তির

কাঠ পুড়ছে বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? যে কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও! তাই ছুটির পরে কর্ম্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্ম্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্ম্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্ত্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে—ভরা জোয়ারের জলের মত সমস্ত থম্‌থম্ করতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে বাড়াবাড়ি কিছু-মাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের

নক্ষত্রমণ্ডলী'! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ঙ্কর উদ্যম কি পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কি কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্ম্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দর রূপ দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব—কর্ম্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে আচ্ছন্ন করে দেব—আমাদের কর্ম্ম, মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলে মধুময় হয়ে উঠবে।

বর্ত্তমান যুগ

আমি পূর্ব্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড় কাল, এর অভ্যন্তরে কি প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্ব-মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য মানব মাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত

এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে, নব পল্লবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে, একে এখন কোনমতেই বাইরের শক্তির দ্বারা চেপে ছোট করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিষটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখচি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্‌স (Politics) বলি। তাকে যত বড় করেই দেখি না কেন, সে নিতান্তই বাহিরের জিনিষ। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করচে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্ম্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে

কাজ করচে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়চে না; পলিটিক্সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন, এইত বিংশ শতাব্দীর বার্ত্তা। বিশ্বাস কর, অনুভব কর, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্ম্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটবে না? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোট বড় যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার

পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তাহা কল্যাণে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোল। প্রস্তরের উপর দিয়ে জলস্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোন ছোট বড় সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হোক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে

দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে হিংসা দ্বেষের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করে ফুটবল খেলে এতবড় একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে? কখনই না—এ হতেই পারে না। এই যুগের ধর্ম্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠ। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হোক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলা ধুলা পড়া শুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জ্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভাল করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখ। বর্ত্তমান কালের একটি সুবিধা এই—বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে

একই সময়ে সকল দেশের লোক তাহা অনুভব করছে। পূর্ব্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেরা তার কোনই খবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়া পৌঁছবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোন স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না—সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মত ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্য্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; নানাদিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রম বাসের সুযোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—

ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বঁউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরা-বউলের, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষ-গুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাথা তুলে ধরছিল, তখনও এই নূতন যুগের কোনই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌছায় নি। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তখনও বিশ্ব মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি, শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তাহার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা

মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল—আমাদের কি পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্ব দেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, দু দিনের নয়—শতাব্দী-ব্যাপী-উৎসব। এই উৎসব কোন বিশেষ স্থানের নয় কোন বিশেষ জাতির নয়—এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এস, আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোন রাজার যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন, নত কর উদ্ধত মস্তক। দূর কর সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জ্জনা। মনকে শুভ্র করে তোল। শান্ত হও, পবিত্র হও।

তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফের। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিন—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।